

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সফিকুল মল্লিক

রোলঃ 23100110419

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সফিকুল মল্লিক

রোলঃ 23100110419

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফাত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সফিকুল মল্লিক, আইডিঃ 23100110419 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফাত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sofikul Mallick

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সফিকুল মল্লিক

আইডিঃ 23100110419

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)	6
১. গবেষণার দর্শন ও লক্ষ্য	6
২. তথ্যের উৎস ও সংকলন (Sources of Data)	6
ক. প্রাথমিক উৎস (Primary Sources):	6
খ. মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources):	7
৩. তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Comparative Analysis)	7
৪. তথ্য যাচাই ও শুদ্ধতা (Validation of Information)	7
৫. সীমাবদ্ধতা (Limitations)	8
অধ্যায় ১: ইসলামি শাসনব্যবস্থা কী?	9
অধ্যায় ২: ইসলামি শাসনব্যবস্থা কি শুধুই ধর্মীয়, নাকি পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা?	11
অধ্যায় ৩: খিলাফাতের ধারণা	13
অধ্যায় ৪: খিলাফাতের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, বিবর্তন ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর (৬৩২ খ্রি. - ১৯২৪ খ্রি.)	17
অধ্যায় ৫: রাসূল ﷺ এর রাষ্ট্র পরিচালনা	26
অধ্যায় ৬: খুলাফায়ে রাশেদীন যুগ	32
অধ্যায় ৭: শূরা ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য (Shura vs. Democracy)	36
অধ্যায় ৮: ইসলামি অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি	40
অধ্যায় ৯: ইসলামি বিচারব্যবস্থা ও মানবাধিকার	43
অধ্যায় ১০: বর্তমান গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সাথে তুলনা	45
অধ্যায় ১১: খিলাফাত ব্যবস্থা আধুনিক বিশ্বে কতটা প্রযোজ্য?	47
অধ্যায় ১২: ইসলামি শাসনব্যবস্থা নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা	49
অধ্যায় ১৩: ভবিষ্যৎ বিশ্ব ও ইসলামি নেতৃত্ব	50
অধ্যায় ১৪: ইসলামি শাসনব্যবস্থায় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি নীতি (বিস্তারিত বিশ্লেষণ) ..	52

অধ্যায় ১৫: ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও জিম্মি নীতি (গভীর বিশ্লেষণ)	54
অধ্যায় ১৬: আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলামি সমাধান (কেস স্টাডি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ)	56
অধ্যায় ১৭: আন্তর্জাতিক আইন ও ইসলামি ভূ-রাজনীতি (২১শ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট)	58
পরিশিষ্ট: ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দলিলের মূলপাঠ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ	60
গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র (Bibliography & References)	65

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

১. গবেষণার দর্শন ও লক্ষ্য

এই গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে একটি Qualitative Research বা গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামি শাসনব্যবস্থার ধ্রুপদী উৎসগুলোর সাথে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহের একটি সেতুবন্ধন তৈরি করা। তথ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে কোনো প্রকার দলীয় সংকীর্ণতা বা আধুনিক কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবমুক্ত থেকে মূল ইসলামি সূত্রাবলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

২. তথ্যের উৎস ও সংকলন (Sources of Data)

গবেষণাটি সম্পন্ন করতে দুই ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে:

ক. প্রাথমিক উৎস (Primary Sources):

- আল-কুরআন: প্রতিটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দাবির ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতের সরাসরি রেফারেন্স ব্যবহার করা হয়েছে।
- হাদিস গ্রন্থাবলি: বিশেষ করে সিহাহ সিত্তাহ (বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ) থেকে বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ঐতিহাসিক দলিল: মদিনা সনদ, হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক আদেশ ও ভাষণকে মূল রেফারেন্স হিসেবে ধরা হয়েছে।

খ. মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources):

- ইমাম মাওয়াদির ‘আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ’ এবং ইবনে খালদুনের ‘মুকাদ্দিমাহ’-এর মতো ধ্রুপদী রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের কাজ।
- আধুনিক ইসলামিক স্কলার ও গবেষকদের (যেমন: ড. তাহে আল-ওয়ানি, ড. ইউসুফ আল-কারজাভি) রাজনৈতিক বিশ্লেষণ।
- সমসাময়িক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের তত্ত্বসমূহ।

৩. তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Comparative Analysis)

বইটিতে ইসলামি খিলাফাত ব্যবস্থার সাথে পশ্চিমা রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি **Comparative Method** প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে দেখা হয়েছে যে, আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার, নারী অধিকার এবং অর্থনৈতিক বন্টন ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামি মডেলটি কতটা কার্যকরী এবং ভারসাম্যপূর্ণ। বিশেষ করে—

- সার্বভৌমত্বের ধারণা (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বনাম জনগণের সার্বভৌমত্ব)।
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া (শূরা বনাম পার্লামেন্ট)।
- অর্থনৈতিক মডেল (যাকাত বনাম পুঁজিবাদী ট্যাক্স)।

৪. তথ্য যাচাই ও শুদ্ধতা (Validation of Information)

কুরআনের আয়াত এবং হাদিসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। কোনো দুর্বল (যয়িফ) বা জাল হাদিস যেন একাডেমিক আলোচনায় না আসে, সেজন্য প্রতিষ্ঠিত হাদিস বিশারদদের (মুহাদ্দিসিন) মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে কাসির এবং ইমাম তাবারির মতো নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

৫. সীমাবদ্ধতা (Limitations)

এই গবেষণাটি মূলত ইসলামি শাসনব্যবস্থার একটি আদর্শিক এবং তাত্ত্বিক রূপরেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে। বর্তমান বিশ্বের জটিল ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পথে যে কৌশলগত চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে, তা একটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য আরও বিস্তৃত ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

অধ্যায় ১: ইসলামি শাসনব্যবস্থা কী?

অধ্যায় পরিচিতি

এই অধ্যায়ে ইসলামি শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা, এর মৌলিক লক্ষ্য এবং আধুনিক political philosophy বা রাজনৈতিক দর্শনের সাথে এর প্রধান পার্থক্যগুলো আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের ভূমিকার বিষয়টি এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে।

১.১ শাসনব্যবস্থার মৌলিক ধারণা

সাধারণ অর্থে শাসনব্যবস্থা হলো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করার পদ্ধতি। ইসলামের দৃষ্টিতে শাসনব্যবস্থা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের ওপর অর্পিত একটি ‘আমানত’। এখানে শাসক ও শাসিত উভয়ই আল্লাহর আইনের কাছে দায়বদ্ধ।

১.২ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (Tauheed in Sovereignty)

ইসলামি শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হলো—সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌমত্ব জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকলেও ইসলাম বলে:

“أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ” “জেনে রেখো, সৃষ্টি যাঁর, নির্দেশও চলবে তাঁরই। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ বরকতময়।” — সূরা আল-আরাফ (৭:৫৪)

এর অর্থ হলো, মৌলিক আইন প্রণয়নের অধিকার কেবল স্রষ্টার। মানুষের কাজ হলো সেই মূলনীতিগুলোর আলোকে বাস্তবসম্মত উপ-আইন বা প্রশাসনিক বিধিমালা তৈরি করা।

১.৩ ইসলামে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

ইসলামে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য দুটি:

১. দ্বীন রক্ষা করা (Hirasat al-Din): মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করা।
২. দুনিয়া পরিচালনা (Siyasat al-Dunya): ইনসাফের ভিত্তিতে মানুষের বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণ করা।

কুরআন মজিদে আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ

“আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সঙ্গে কিতাব ও তুলাদণ্ড (মিযান) অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ ইনসাফ কায়েম করতে পারে।” — সূরা আল-হাদীদ (৫৭:২৫)

১.৪ দীন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

পশ্চিমা সেক্যুলারিজমে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করা হলেও ইসলামে এই দুটির বিচ্ছেদ অসম্ভব। রাষ্ট্র হলো একটি যন্ত্র, আর দীন হলো সেই যন্ত্রের চালিকাশক্তি। ইমাম গাজ্জালি (রহ.)-এর মতে, “দীন হলো ভিত্তি আর রাষ্ট্র হলো তার পাহারাদার। যার ভিত্তি নেই তা ধ্বংস হয়ে যায়, আর যার পাহারাদার নেই তা হারিয়ে যায়।”

অধ্যায় সারাংশ

ইসলামি শাসনব্যবস্থা মূলত একটি নৈতিক ও ঐশী আইনভিত্তিক ব্যবস্থা যেখানে শাসক জনগণের সেবক এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এটি কোনো যাজকতন্ত্র (Theocracy) নয়, বরং এটি একটি ইনসাফভিত্তিক আইনি রাষ্ট্রব্যবস্থা।

অধ্যায় ২: ইসলামি শাসনব্যবস্থা কি শুধুই ধর্মীয়, নাকি পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা?

অধ্যায় পরিচিতি

অনেকে মনে করেন ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত কেন্দ্রিক একটি ধর্ম। এই অধ্যায়ে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইতিহাসের আলোকে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইসলাম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

২.১ ইসলাম কি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা?

ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—আলোচনা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” — সূরা আল-মায়দাহ (৫:৩)

২.২ কুরআন ও সুন্নাহতে political নির্দেশনা

কুরআনে কেবল আধ্যাত্মিক বিষয় নয়, বরং রাষ্ট্র পরিচালনার স্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে:

- বিচারব্যবস্থা:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ “আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।” (সূরা আন-নিসা, ৪:৫৮)

- পরামর্শ

(শূরা):

وَإِذَا مَرُّهُمْ شُورَىٰ “আর তাদের কাজ সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।” (সূরা আশ-শূরা, ৪২:৩৮)

২.৩ রাসূল ﷺ এর রাষ্ট্র পরিচালনা: একটি ঐতিহাসিক বাস্তবায়ন

নবী মুহাম্মদ ﷺ মদিনায় হিজরতের পর কেবল একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, Social Contract বা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে তিনি ছিলেন মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী

(Chief Executive), প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান বিচারক। 'মদিনা সনদ' ছিল বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান, যা প্রমাণ করে যে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক কাঠামোর প্রবক্তা।

২.৪ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান উপাদান চারটি: ভূখণ্ড, জনসংখ্যা, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। মদিনা রাষ্ট্রে এই চারটি উপাদানেরই সফল প্রয়োগ ছিল। তবে পার্থক্য হলো, এখানে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, আর সরকার হলো সেই সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি বা 'খলিফা'।

২.৫ সেকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা বনাম ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তা

বৈশিষ্ট্য	সেকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা	ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তা
আইনের উৎস	মানুষের ইচ্ছা/সংখ্যাগরিষ্ঠতা	কুরআন ও সুন্নাহ (ঐশী আইন)
নৈতিকতা	পরিবর্তনশীল আপেক্ষিক	ও স্থায়ী ও শাস্ত্রত
জবাবদিহিতা	কেবল জনগণের কাছে	জনগণের কাছে এবং আল্লাহর কাছে

অধ্যায় সারাংশ

ইসলাম একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা (Total System)। যারা ইসলামকে কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, তারা মূলত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপকে অস্বীকার করে। রাসূল ﷺ এর মদিনা জীবনই এর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রমাণ।

অধ্যায় ৩: খিলাফাতের ধারণা

অধ্যায় পরিচিতি

এই অধ্যায়ে ইসলামি শাসনব্যবস্থার মূল রাজনৈতিক কাঠামো ‘খিলাফাত’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ও পারিভাষিক অর্থ, কুরআন ও সুন্নাহতে এর আইনি ভিত্তি এবং আধুনিক রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের সাথে এর মৌলিক পার্থক্যসমূহ নিবিড়ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ খলিফা ও খিলাফাত শব্দের অর্থ

আরবি ‘খিলাফাত’ (خِلَافَة) শব্দের মূল ধাতু ‘খলফ’ (خَلَفَ), যার অর্থ পেছনে আসা, স্থলাভিষিক্ত হওয়া বা প্রতিনিধিত্ব করা। রাজনৈতিক পরিভাষায়, খিলাফাত হলো এমন একটি শাসনব্যবস্থা যা নবুয়তের আদলে দ্বীন রক্ষা এবং পার্থিব বিষয়াদি পরিচালনার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। আর যিনি এই পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাকে ‘খলিফা’ বা ‘আমিরুল মুমিনিন’ বলা হয়।

৩.২ কুরআন ও হাদিসে খিলাফাত

মানবজাতির সৃষ্টির সূচনালগ্নেই আল্লাহ তাআলা খিলাফাতের ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআনে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

“আর স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলেছিলেন, ‘আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি’।” — সূরা আল-বাকারা (২:৩০)

রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্তদের ইনসাফ কায়েমের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

“হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) করেছি; অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করো এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।” — সূরা সোয়াদ (৩৮:২৬)

হাদিস শরিফেও খিলাফাত এবং নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা স্পষ্ট করা হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: “বনি ইসরাইলের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবী ইন্তেকাল করতেন, তখনই অন্য নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই, তবে অচিরেই বহু খলিফার আত্মপ্রকাশ ঘটবে।” — সহিহ বুখারি, অধ্যায়: আশ্বিয়া, হাদিস নং ৩৪৫৫

৩.৩ খিলাফাত বনাম রাজতন্ত্র (Monarchy)

অনেকে খিলাফাতকে মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে খিলাফাত ও রাজতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি ব্যবস্থা:

- **জনগণের সম্মতি (Bay'ah):** খিলাফাতে জোরপূর্বক বা বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষমতা দখল করা যায় না। এটি জনগণের স্বাধীন 'বাইয়াত' বা সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে, রাজতন্ত্রে ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে বা তরবারির জোরে অর্জিত হয়।
- **আইনের শাসন:** খলিফা আইনের ঊর্ধ্বে নন। সাধারণ নাগরিকের মতো খলিফাও শরিয়াহর আইনের অধীন। রাজতন্ত্রে রাজার কথাই আইন (The King can do no wrong), কিন্তু ইসলামে এই ধারণার কোনো স্থান নেই।
- **সম্পদের মালিকানা:** রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা হয়। খিলাফাতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) হলো জনগণের আমানত, যা থেকে খলিফা কেবল নিজের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম ভাতা নিতে পারেন।

৩.৪ খেলাফতের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য

খিলাফাত ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হলো তিনটি নীতি:

1. **ইনসাফ (Justice):** জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার সমান আইনি অধিকার নিশ্চিত করা।
2. **আমানতদারিতা (Trusteeship):** ক্ষমতাকে ভোগবিলাসের মাধ্যম না ভেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া পবিত্র আমানত মনে করা।

3. জনকল্যাণ (Maṣlahah): নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।

৩.৫ খিলাফাতের স্তম্ভসমূহ: একটি গভীর বিশ্লেষণ

ইসলামি খিলাফাত ব্যবস্থা চারটি মৌলিক স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এই স্তম্ভগুলো দুর্বল হলে শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট হয়:

1. শরীয়াহর শাসন (Rule of Shariah): কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর খেয়াল-খুশি নয়, বরং আল্লাহর আইনই হবে চূড়ান্ত মানদণ্ড।
2. শূরা বা পরামর্শ (Consultation): খলিফা একনায়ক নন; তিনি অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিদের পরামর্শ নিতে বাধ্য।
3. বাইয়াত বা জনগণের সম্মতি (Social Contract): শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যেখানে শাসক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দেন এবং শাসিত আনুগত্যের।
4. উলুল আমর বা যোগ্য নেতৃত্ব: নেতার প্রধান যোগ্যতা হবে আমানতদারিতা এবং জ্ঞান।

৩.৬ খিলাফাত কি কোনো থিওক্র্যাসি বা যাজকতন্ত্র?

পাশ্চাত্যের অনেক গবেষক খিলাফাতকে ইউরোপীয় মধ্যযুগীয় 'থিওক্র্যাসি'র সাথে তুলনা করেন। কিন্তু খিলাফাত থিওক্র্যাসি নয়। কারণ:

- থিওক্র্যাসিতে ধর্মযাজকরা নিজেদের অত্রান্ত (Infallible) দাবি করেন; কিন্তু খলিফা অত্রান্ত নন, তিনি ভুল করলে সাধারণ মানুষ তাঁকে সংশোধন করতে পারে।
- থিওক্র্যাসিতে আইন পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই, কিন্তু ইসলামে 'ইজতিহাদ'-এর মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে নতুন প্রশাসনিক আইন তৈরির সুযোগ রয়েছে।

খিলাফাতের তেরো শতকের দীর্ঘ ইতিহাস, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, শাসনতান্ত্রিক বিবর্তন এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরকে নিবিড়ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এই অধ্যায়টিকে অত্যন্ত বিস্তারিত এবং গবেষণাধর্মী আকারে নিচে সম্প্রসারিত করা হলো। প্রতিটি যুগের

রাজনৈতিক জটিলতা, প্রশাসনিক সংস্কার এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রভাবকে এখানে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যা আপনার বইয়ের কলেবরকে অন্তত ১৫ পৃষ্ঠার সমপরিমাণ গভীরতা ও বিশালতা দান করবে।

অধ্যায় সারাংশ

খিলাফাত কোনো ব্যক্তি বা রাজবংশের শাসন নয়, বরং এটি আদর্শিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শাসনব্যবস্থা। এটি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে গঠিত এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যার মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

অধ্যায় ৪: খিলাফাতের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, বিবর্তন ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর (৬৩২ খ্রি. – ১৯২৪ খ্রি.)

ভূমিকা

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাসে ‘খিলাফাত’ কেবল একটি রাজনৈতিক শব্দ নয়, বরং এটি উম্মাহর ঐক্য, শরিয়াহর প্রয়োগ এবং বিশ্বজনীন ইনসাফ প্রতিষ্ঠার একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতীক। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর থেকে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে উসমানীয় খিলাফাতের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি পর্যন্ত—প্রায় তেরো শতক ধরে এই ব্যবস্থা পৃথিবীর বুকে টিকে ছিল। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় খিলাফাত কখনো তার আদর্শিক চূড়ায় পৌঁছেছে, আবার কখনো রাজতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে বিবর্তিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা খিলাফাতের এই বিশাল ঐতিহাসিক সিকোয়েন্স, এর উত্থান-পতন এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরকে নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করব।

১. খিলাফাতে রাশেদাহ (১১ হিজরি – ৪১ হিজরি / ৬৩২ খ্রি. – ৬৬১ খ্রি.): আদর্শিক ও স্বর্ণযুগ

খিলাফাতে রাশেদাহ বা ‘সঠিক পথপ্রাপ্ত খলিফাদের যুগ’ হলো ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ডিএনএ (DNA)। এই ৩০ বছরের শাসনকালকে খিলাফাতের বিশুদ্ধতম রূপ মনে করা হয়, কারণ এই যুগের খলিফাগণ ক্ষমতার লোভ বা বংশীয় আধিপত্যের উদ্বেগে উঠে সম্পূর্ণ নবুয়তের আদলে (Minhaj-an-Nubuwwah) রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন।

১.১ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) (৬৩২–৬৩৪ খ্রি.): খিলাফাতের প্রথম সংকট ও অস্তিত্ব রক্ষা

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর সমগ্র আরব উপদ্বীপে এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই কঠিন মুহূর্তে সাকিফা বনি সায়েদাহ-তে সাহাবিদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হযরত আবু বকর (রা.) প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন।

- **রিদ্দার যুদ্ধ (Wars of Apostasy):** রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর বহু আরব গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং মুসায়লিমা কাযযাবের মতো বেশ কয়েকজন ভণ্ড নবীর উত্থান ঘটে। হযরত আবু বকর (রা.) রাজনৈতিক

আপোসের নীতি বর্জন করে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কঠোর অবস্থান নেন এবং সফলভাবে বিদ্রোহ দমন করেন।

- **কুরআন সংকলন:** ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফেজে কুরআন শাহাদাত বরণ করলে হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শে খলিফা আবু বকর (রা.) জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রথম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কুরআনের বিক্ষিপ্ত অংশগুলো একত্রিত করে একটি গ্রন্থরূপ (মুসহাফ) দান করেন।

১.২ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.): প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা ও বৈশ্বিক সাম্রাজ্যে রূপান্তর

হযরত উমর (রা.)-এর ১০ বছরের শাসনকাল ছিল খিলাফাতের প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক বিকাশের স্বর্ণযুগ। তাঁর যুগে খিলাফাত কেবল আরবের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে পারস্য (সাসানীয়) এবং রোমান (বাইজেন্টাইন) সাম্রাজ্যের বিশাল অংশ গ্রাস করে।

- **প্রশাসনিক ডেস্কে বিপ্লব:** তিনি বিশাল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে (যেমন: মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, কুফা, বসরা, মিশর) বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি প্রদেশে ‘ওয়ালি’ (গভর্নর) এবং ‘কাজি’ (বিচারক) নিয়োগ করেন। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা হয়।
- **দিওয়ান ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র:** তিনি ‘দিওয়ানুল খারাজ’ (রাজস্ব বিভাগ) এবং ‘দিওয়ানুল জুন্দ’ (সামরিক বিভাগ) প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসে তিনিই প্রথম নিয়মিত পুলিশ বাহিনী, নৈশকালীন প্রহরা ব্যবস্থা, ডাক বিভাগ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন। হিজরি সন বা ইসলামিক ক্যালেন্ডারের প্রবর্তনও তাঁর অন্যতম কালজয়ী কীর্তি।

১.৩ হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.): ভৌগোলিক বিস্তার ও অভ্যন্তরীণ জটিলতা

হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর একটি উচ্চপর্যায়ের নির্বাচক কমিটির মাধ্যমে হযরত উসমান (রা.) খলিফা মনোনীত হন। তাঁর ১২ বছরের শাসনের প্রথম অর্ধেক ছিল অত্যন্ত সফল এবং বিজয়ে ভরপুর।

- **নৌবাহিনী গঠন ও প্রমিত কুরআন:** উম্মাহর ইতিহাসে প্রথম ইসলামিক নৌবাহিনী গঠিত হয় তাঁর যুগে, যার মাধ্যমে সাইপ্রাস ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে খিলাফাতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে

কুরআনের তিলাওয়াতে বিকৃতি রোধে তিনি মদিনার মূল কপি থেকে অনুলিপি তৈরি করে সমস্ত প্রদেশে পাঠান, এজন্য তাঁকে ‘জামিউল কুরআন’ বলা হয়।

- **অভ্যন্তরীণ ফিতনা ও শাহাদাত:** তাঁর শাসনের শেষভাগে দূরবর্তী প্রদেশগুলো থেকে স্বজনপ্রীতির মিথ্যা অভিযোগ তুলে একদল চরমপন্থী (আবদুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারী) মদিনা ঘেরাও করে এবং কুরআন তিলাওয়াত রত অবস্থায় এই বৃদ্ধ খলিফাকে নিষ্ঠুরভাবে শহীদ করে। এটি খিলাফতের ইতিহাসে প্রথম বড় রাজনৈতিক ফাটল।

১.৪ হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.): গৃহযুদ্ধ ও তীব্র রাজনৈতিক সংকট ব্যবস্থাপনা

হযরত উসমানের শাহাদাতের পর মদিনার চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে হযরত আলী (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব নেন। তাঁর পুরো ৫ বছরের শাসনকাল ছিল অভ্যন্তরীণ ফিতনা ও গৃহযুদ্ধ (Civil War) দমনে নিবেদিত।

- **রাজধানী স্থানান্তর ও যুদ্ধসমূহ:** কৌশলগত কারণে তিনি খিলাফতের রাজধানী মদিনা থেকে ইরাকের কুফায় স্থানান্তর করেন। খলিফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রশ্নে তাঁর সাথে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.)-এর (জমেলের যুদ্ধ) এবং সিরিয়ার গভর্নর আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর (সিফফিনের যুদ্ধ) সংঘাত হয়।
- **খারেজিদের উত্থান ও খিলাফাতে রাশেদাহর অবসান:** যুদ্ধ চলাকালীন একদল চরমপন্থী খলিফা আলীর দল ত্যাগ করে, যাদের ‘খারেজি’ বলা হয়। অবশেষে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে খারেজি আততায়ী আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমের তরবারির আঘাতে হযরত আলী (রা.) শাহাদাত বরণ করলে খিলাফাতে রাশেদাহর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

২. উমাইয়া খিলাফাত (৪১ হিজরি – ১৩২ হিজরি / ৬৬১ খ্রি. – ৭৫০ খ্রি.): রাজতান্ত্রিক রূপান্তর ও বিশ্বসাম্রাজ্য

হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত হাসান (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। কিন্তু উম্মাহর রক্তপাত বন্ধ এবং ঐক্যের স্বার্থে তিনি মাত্র ৬ মাস পর সিরিয়ার গভর্নর আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইসলামের

ইতিহাসে এই বছরটিকে (৪১ হিজরি) ‘আমুল জামায়াত’ বা ঐক্যের বছর বলা হয়। এর মাধ্যমেই দামেস্ককে কেন্দ্র করে উমাইয়া খিলাফতের সূচনা ঘটে।

২.১ বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের সূচনা (Dynastic Rule)

আমির মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর মৃত্যুর আগে ছেলে ইয়াজিদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। এর মাধ্যমে খিলাফতের সনাতন ‘শূরা’ বা গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি ভেঙে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের (Monarchy) রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরের ফলে মদিনার আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের বদলে সিরিয়ার রাজনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্র খিলাফতের চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়। ইয়াজিদের আমলে কারবালার মর্মান্তিক ট্রাজেডি এবং পবিত্র কাবার ওপর আক্রমণ উমাইয়াদের রাজনৈতিক বৈধতাকে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

২.২ আব্দুল মালিক ও ওয়ালিদ: উমাইয়া যুগের স্বর্ণসময়

প্রাথমিক বিশৃঙ্খলা কাটার পর খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের হাত ধরে উমাইয়া শাসন এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়।

- **আরবিভাষী ও নিজস্ব মুদ্রা:** তিনি খিলাফতের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ফারসি ও গ্রিকের পরিবর্তে ‘আরবি’ বাধ্যতামূলক করেন। রোমান ও পারস্যীয় মুদ্রার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে প্রথম খাঁটি ইসলামিক ‘স্বর্ণ দিনার’ ও ‘রৌপ্য দিরহাম’ চালু করেন। জেরুজালেমের বিখ্যাত ‘ডোম অব দ্য রক’ (কুব্বাতুস সাখরা) তাঁর আমলেই নির্মিত হয়।
- **ভৌগোলিক দিগ্বিজয়:** আব্দুল মালিকের ছেলে ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের আমলে খিলাফাত ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম স্থলসাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এই যুগে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু (ভারতবর্ষ), কুতাইবা বিন মুসলিমের নেতৃত্বে মধ্য এশিয়া (সমরকন্দ, বুখারা) এবং তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে আন্দালুসিয়া বা স্পেন বিজিত হয়। খিলাফতের সীমানা তখন আটলান্টিক মহাসাগর থেকে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

২.৩ উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.): ব্যতিক্রমী রাশেদি আলোকবর্তিকা

উমাইয়া বংশের দীর্ঘ রাজতান্ত্রিক ধারার মধ্যে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) (৭১৭-৭২০ খ্রি.) ছিলেন এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম। তিনি খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেই রাজকীয় বিলাসিতা ও উমাইয়া রাজপরিবারের অবৈধভাবে দখলকৃত সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মালে বাজেয়াপ্ত করেন।

- **সামাজিক ইনসাফ ও দারিদ্র্য মুক্তি:** তিনি মওলা বা অনারব মুসলিমদের ওপর থেকে অন্যায় কর (জিয্যা) প্রত্যাহার করেন। তাঁর আড়াই বছরের শাসনে সুষম সম্পদ বণ্টনের ফলে খিলাফতে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, যাকাত নেওয়ার মতো কোনো দরিদ্র মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না। তাঁর এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁকে ‘পঞ্চম খুলাফায়ে রাশেদীন’ বলা হয়।

২.৪ উমাইয়াদের পতন

উমর ইবনে আবদুল আজিজের ওফাতের পর উমাইয়া শাসকেরা পুনরায় বিলাসিতা এবং অনারব মুসলিমদের (মওলা) প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে পারস্য ও খোরাসান অঞ্চলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাসের বংশধরেরা ‘আব্বাসীয় আন্দোলন’ শুরু করে। অবশেষে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে ‘যাবের যুদ্ধে’ শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ানকে পরাজিত করে আব্বাসীয়রা ক্ষমতা দখল করে। (তবে উমাইয়া বংশের এক যুবরাজ আব্দুর রহমান আল-দাখিল অলৌকিকভাবে পালিয়ে স্পেনে চলে যান এবং সেখানে স্বাধীন ‘কর্ডোভা খিলাফাত’ প্রতিষ্ঠা করেন)।

৩. আব্বাসীয় খিলাফাত (১৩২ হিজরি – ৬৫৬ হিজরি / ৭৫০ খ্রি. – ১২৫৮ খ্রি.): জ্ঞানের স্বর্ণযুগ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

আব্বাসীয়রা ক্ষমতা দখল করার পর খিলাফতের রাজধানী সিরিয়া থেকে সরিয়ে ইরাকের বাগদাদে নিয়ে আসে। এই যুগটি সামরিক আগ্রাসনের চেয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈভবের জন্য বিশ্ব ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

৩.১ বাগদাদ নগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বর্ণযুগ

খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর টাইগ্রিস নদীর তীরে একটি বৃত্তাকার পরিকল্পিত শহর হিসেবে ‘বাগদাদ’ নির্মাণ করেন। এটি দ্রুতই বিশ্বের বাণিজ্য ও জ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। আব্বাসীয় যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত খলিফা ছিলেন হারুন আল-রশিদ এবং তাঁর পুত্র মামুন আল-রশিদ।

- **বাইতুল হিকমাহ (House of Wisdom):** খলিফা মামুন বাগদাদে একটি বিশাল একাডেমি ও অনুবাদ কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এখানে গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত এবং ফারসি ভাষার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বইগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হতো। এই যুগের রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে (মুতাযিলা দর্শন) রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল।

৩.২ ক্ষমতার বিবর্তন ও প্রতীকী খিলাফাত (The Decline of Central Power)

আব্বাসীয় খিলাফতের বিশালতার কারণেই নবম শতাব্দীর পর থেকে দূরবর্তী প্রদেশগুলোর ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হতে থাকে। খলিফারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তুর্কি দাস-সৈনিকদের (মামলুক) ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফলে একপর্যায়ে খলিফারা তুর্কি সেনানায়কদের হাতের পুতুলে পরিণত হন।

- **আঞ্চলিক রাজবংশের উত্থান:** খিলাফতের ভেতরেই ছোট ছোট স্বাধীন রাজবংশের উত্থান ঘটে—যেমন মিশরে ফাতেমীয় (যারা সমান্তরাল শিয়া খিলাফাত দাবি করেছিল), ইরানে বুয়াইহিদ এবং মধ্য এশিয়ায় সেলজুক সাম্রাজ্য। এই সময়ে আব্বাসীয় খলিফাদের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা প্রায় শূন্য হয়ে যায়, তবে মুসলিম বিশ্বের ‘ধর্মীয় ও প্রতীকী প্রধান’ হিসেবে খলিফার পদটি টিকে থাকে। সুলতানেরা শাসন করলেও খলিফার নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করা হতো।

৩.৩ মঙ্গোল ধ্বংসযজ্ঞ ও বাগদাদের পতন (১২৫৮ খ্রি.)

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে চেঙ্গিস খানের পৌত্র হলাকু খানের নেতৃত্বে মঙ্গোল বাহিনী বাগদাদ অবরোধ করে। শেষ আব্বাসীয় খলিফা আল-মুস্তাসিম বিল্লাহকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মঙ্গোলরা বাগদাদের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে এবং বাইতুল হিকমাহর কোটি কোটি বই টাইগ্রিস নদীতে ফেলে দেয়, যার কালিতে নদীর পানি কালো হয়ে গিয়েছিল। এর মাধ্যমে বাগদাদের কেন্দ্রীয় আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটে। (পরবর্তীতে মিশরের মামলুক সুলতানেরা আব্বাসীয় বংশের এক যুবরাজকে কায়রোতে এনে পুনরায় ‘প্রতীকী খলিফা’ হিসেবে বসিয়ে রাখেন, যা ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল)।

৪. উসমানীয় বা অটোমান খিলাফাত (৯২৩ হিজরি – ১৩৪২ হিজরি / ১৫১৭ খ্রি. – ১৯২৪ খ্রি.): ইউরোপে ইসলামের বিস্তার ও অবসান

১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আনাতোলিয়ায় (বর্তমান তুরস্ক) উসমান গাজী নামক এক বীরের হাত ধরে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ (আল-ফাতিহ) খ্রিষ্টানদের অভ্যেদ্য দুর্গ কনস্টান্টিনোপল জয় করে এর নাম রাখেন ‘ইস্তাম্বুল’ এবং একে সাম্রাজ্যের রাজধানী করেন।

৪.১ খিলাফতের আরবে প্রত্যাবর্তন থেকে তুর্কিতে স্থানান্তর

১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে উসমানীয় সুলতান প্রথম সেলিম (সেলিম দ্য গ্রিম) মিশর ও সিরিয়া জয় করেন। মক্কার শরিফ উসমানীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে কাবার চাবি সুলতান সেলিমের কাছে হস্তান্তর করেন। কায়রোর শেষ প্রতীকী আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফতের পদবী উসমানীয় সুলতানদের কাছে ছেড়ে দেন। এর মাধ্যমে খিলাফাত আরবের কুরাইশ বংশ থেকে তুর্কি জাতির কাছে হস্তান্তরিত হয়।

৪.২ সুলাইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট ও বৈশ্বিক শক্তি

সুলতান সুলাইমানের আমলে (১৫২০-১৫৬৬ খ্রি.) উসমানীয় খিলাফাত তার শক্তির চূড়ায় পৌঁছায়। তিনি হাঙ্গেরি, বেলগ্রেড জয় করে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা পর্যন্ত অবরোধ করেন। তিনি শরিয়াহর ওপর ভিত্তি করে খিলাফতের পুরো আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামোকে নতুন রূপ দেন, এজন্য তাঁকে ‘কানুনি’ (আইনদাতা) বলা হয়। এই যুগে খিলাফাত ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর এবং পারস্য উপসাগরে শক্তিশালী নৌ-আধিপত্য বজায় রেখেছিল।

৪.৩ খিলাফতের পতন ও আধুনিক সেক্যুলারাইজেশন

১৮শ এবং ১৯শ শতাব্দীতে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব ও আধুনিকায়নের বিপরীতে উসমানীয় খিলাফাত সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়তে থাকে। খিলাফাতকে তখন ‘ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি’ (Sick Man of Europe) বলা হতো। খিলাফাত রক্ষার্থে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ ‘প্যান-ইসলামিজম’ বা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের ডাক দেন এবং হেজাজ রেলওয়ের মতো প্রকল্প হাতে নেন, কিন্তু ব্রিটিশ ও জার্মানবাদী ষড়যন্ত্র এবং অভ্যন্তরীণ ‘ইয়ং তুর্কস’ নামক পশ্চিমা ভাবধারার তরুণদের কারণে তিনি ব্যর্থ হন।

৪.৪ ১৯২৪: খিলাফাত ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.) উসমানীয় খিলাফাত জার্মানির পক্ষে অংশ নিয়ে পরাজিত হয়। মিত্রবাহিনী (ব্রিটেন ও ফ্রান্স) খিলাফতের সমস্ত অংশ (মধ্যপ্রাচ্য) নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় (সাইকস-পিকট চুক্তি)। তুরস্কের মূল ভূখণ্ড রক্ষার্থে সামরিক কমান্ডার মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক এক যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং ক্ষমতায় বসেন। অবশেষে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা মার্চ আতাতুর্ক তুর্কি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে আইন পাসের মাধ্যমে তেরো শতকের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ‘খিলাফাত’

সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং শেষ খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদকে দেশত্যাগে বাধ্য করেন।

খিলাফাতের বিবর্তন ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরের সারসংক্ষেপ (ম্যাট্রিক্স)

বইয়ের গভীরতা এবং পাঠকের এক নজরে বোঝার সুবিধার্থে খিলাফাতের এই দীর্ঘ তেরো শতকের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন নিচে একটি তুলনামূলক ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

খিলাফাতের ঐতিহাসিক যুগ	সময়কাল (খ্রি.)	রাজনৈতিক চরিত্র	আইনি বিচারিক কাঠামো ও	প্রধান অর্থনৈতিক উৎস	পতনের মূল কারণ
খুলাফায়ে রাশেদীন	৬৩২ – ৬৬১	বিশুদ্ধ শূরা ও গণতান্ত্রিক ঐকমত্য	শরিয়াহর কঠোর প্রয়োগ, স্বাধীন বিচার বিভাগ	বায়তুল মাল, যাকাত, ফাই, গণিমত	খারেজি ও অভ্যন্তরীণ চরমপন্থীদের ফিতনা ও হত্যাকাণ্ড
উমাইয়া খিলাফাত	৬৬১ – ৭৫০	বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র, আরব-কেন্দ্রিকতা	শরিয়াত ভিত্তিক, তবে খলিফার রাজনৈতিক প্রভাব ছিল	দিনার-দিরহাম প্রবর্তন, খারাজ ও বিজিত অঞ্চলের কর	অনারব মুসলিমদের (মওলা) ক্ষোভ ও আব্বাসীয় ক্রুসেড
আব্বাসীয় খিলাফাত	৭৫০ – ১২৫৮	আমলাতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শাসন	মজহাবসমূহের বিকাশ ও আইনি কোডিফিকেশন	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, কৃষি ও বাইতুল হিকমাহর অর্থনীতি	তুর্কি সৈন্যদের অতি-প্রভাব ও মঙ্গোলদের বাগদাদ ধ্বংস

উসমানীয় খিলাফাত	১৫১৭ - ১৯২৪	সামরিক সালতানাত ও প্যান- ইসলামিজম	‘কানুন’ ও শরিয়াহর প্রাতিষ্ঠানিক মিশ্রণ	ল্যান্ড ট্যাক্স, ইউরোপীয় বাণিজ্য রুট, হেজাজ ফান্ড	প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় ও আতাতুর্কের সেক্যুলার বিপ্লব
---------------------	----------------	--	---	---	---

উপসংহার: খিলাফতের ইতিহাসের শিক্ষা

খিলাফাতের এই দীর্ঘ পরিক্রমা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি কোনো স্থবির বা অপরিবর্তনশীল শাসনব্যবস্থা ছিল না। যুগ ও প্রযুক্তির প্রয়োজনে খিলাফাত মদিনার সাদামাটা প্রশাসনিক কক্ষ থেকে বাগদাদের বিলাসবহুল আমলাতন্ত্র এবং ইস্তাম্বুলের আধুনিক সামরিক কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে। খিলাফতের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ছিল—তাকওয়া, সুশাসন এবং ইনসাফ। আর এর পতনের মূল কারণ ছিল—শূরা পদ্ধতি বর্জন করে রাজতন্ত্রের আলিঙ্গন, ক্ষমতার কোন্দল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমকালীন বিশ্ব থেকে পিছিয়ে পড়া। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই দীর্ঘ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েই উম্মাহকে তার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক চিন্তার রূপরেখা তৈরি করতে হবে।

অধ্যায় ৫: রাসূল ﷺ এর রাষ্ট্র পরিচালনা

অধ্যায় পরিচিতি

ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তা ও খিলাফাত ব্যবস্থার বাস্তব ও প্রায়োগিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পবিত্র হাত ধরে। নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর কেবল একটি ধর্মীয় সমাজ নয়, বরং পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে অনন্য ও ইনসাফভিত্তিক একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অনেকে ইসলামকে কেবল ব্যক্তিগত উপাসনার ধর্ম মনে করলেও মদিনা রাষ্ট্রের সফল পরিচালনা প্রমাণ করে যে, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই অধ্যায়ে আমরা মদিনা রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কার, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি এবং অমুসলিমদের অধিকার অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ও একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করব।

৫.১ মদিনা সনদ (The Constitution of Medina): বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান

৫.১.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও রাষ্ট্রের উপাদান

৬২২ খ্রিষ্টাব্দে আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন ইয়াসরিবে (পরবর্তীতে মদিনাতুননবী বা মদিনা) আগমন করেন, তখন সেখানকার সামাজিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল ও সংঘাতপূর্ণ। মদিনায় প্রধানত দুটি বড় আরব গোত্র (আউস ও খায়রাজ) দীর্ঘকাল ধরে বুয়াসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এর পাশাপাশি সেখানে ইহুদিদের তিনটি বড় শক্তিশালী গোত্র (বনু কাইনুকা, বনু নাযির ও বনু কুরাইজা) এবং কিছু পৌত্তলিক গোত্র বসবাস করত। একটি ভূখণ্ডে এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও ধর্মের মানুষকে একত্রিত করে একটি টেকসই শান্তিময় রাষ্ট্র গঠন করা ছিল সমকালীন বিশ্বের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক মনে করা হয় যাঁদের, তাঁদের বহু শতাব্দী আগে রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি লিখিত চুক্তির মাধ্যমে মদিনাকে একটি ‘সার্বভৌম রাষ্ট্র’ হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নিজেই তার রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় একটি রাষ্ট্রের জন্য চারটি উপাদান আবশ্যিক: নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসংখ্যা, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। ‘মদিনা সনদ’-এর মাধ্যমে এই চারটি উপাদানই পূর্ণতা পায়।

৫.১.২ সনদের মূল ধারা ও রাজনৈতিক গুরুত্ব

মদিনা সনদে মোট ৪৭টি (মতান্তরে ৫২টি) ধারা ছিল। এই ধারাগুলো কেবল একটি ধর্মীয় চুক্তি ছিল না, বরং এটি ছিল একটি বহুত্ববাদী (Pluralistic) সমাজের জন্য পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র বা সংবিধান। এর প্রধান ধারাগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- **একক উম্মাহর ধারণা (A Single Ummah):** সনদের প্রথম ধারায় বলা হয়, মক্কার মুহাজিরিন, মদিনার আনসার এবং যারা তাদের অনুসারী হয়ে খিলাফাত ও রাষ্ট্রের সুরক্ষায় কাজ করবে, তারা সবাই মিলে অন্যান্য মানুষের বিপরীতে একটি ‘একক জাতি’ বা ‘উম্মাহ’ (One Nation) গঠন করবে। এটি ছিল বংশ ও গোত্রীয় গোঁড়ামির উচ্ছেদ ঘটিয়ে আদর্শিক জাতীয়তাবাদের প্রথম রাষ্ট্রীয় ঘোষণা।
- **ধর্মীয় স্বাধীনতা (Religious Freedom):** সনদের ২৫ নম্বর ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়: “ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম এবং মুসলিমদের জন্য তাদের ধর্ম।” অর্থাৎ, রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোনো অমুসলিম নাগরিককে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা যাবে না এবং তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে।
- **যৌথ প্রতিরক্ষা (Joint Defense):** মদিনা রাষ্ট্রের ওপর যদি কোনো বহিরাগত শত্রু বা মক্কার কুরাইশরা আক্রমণ করে, তবে মুসলিম এবং ইহুদি উভয় পক্ষ মিলে যৌথভাবে সেই আক্রমণ প্রতিহত করবে এবং যুদ্ধের ব্যয়ভার প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী বহন করবে।
- **সর্বোচ্চ আদালত ও সার্বভৌমত্ব:** রাষ্ট্রে বসবাসকারী গোত্রগুলোর মধ্যে যদি কোনো বিরোধ বা রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তবে তার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য বিষয়টি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল মুহাম্মদ ﷺ-এর দরবারে পেশ করতে হবে। এর মাধ্যমে মদিনা রাষ্ট্রে আল্লাহর আইনের সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিচারিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫.২ প্রশাসনিক ও বিচারব্যবস্থা (Administrative & Judicial Structure)

৫.২.১ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশাসন

রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনা রাষ্ট্রকে একটি বিকেন্দ্রীকৃত (Decentralized) আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় বিন্যস্ত করেছিলেন। তিনি নিজে মদিনায় কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা করতেন, কিন্তু খিলাফাত ও রাষ্ট্রের সীমানা যখন বৃদ্ধি পেতে শুরু করল, তখন তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধি বা গভর্নর (ওয়ালি) নিয়োগ করতে শুরু করেন।

যেমন, তিনি হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের গভর্নর এবং কর সংগ্রাহক হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। প্রেরণের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে যে প্রশাসনিক গাইডলাইন দিয়েছিলেন, তা আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কীভাবে বিচার করবে?" মুয়াজ (রা.) উত্তর দিলেন, "আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি তাতে না পাও?" তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী।" রাসুলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, "যদি তাতেও না পাও?" মুয়াজ (রা.) উত্তর দিলেন, "তাহলে আমি আমার মেধা ও ইজতিহাদ (গবেষণা) প্রয়োগ করব এবং এতে কোনো ত্রুটি করব না।" রাসুলুল্লাহ ﷺ এই উত্তর শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর বুকে হাত দিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন (সুনান আবু াউদ)।

৫.২.২ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন

মদিনা রাষ্ট্রে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ রাখা হয়েছিল। আইন ছিল সবার জন্য সমান, সেখানে কোনো বংশীয় মর্যাদা বা রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর সুযোগ ছিল না। সমকালীন আরবে যেখানে ধনকুবের ও প্রভাবশালী গোত্রের জন্য আলাদা আইন ছিল, সেখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ আইনের শাসনের এক চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

কুরাইশ বংশের মাখযুম গোত্রের এক নারী যখন চুরির অপরাধে ধরা পড়ে, তখন ওসামা বিন যায়েদ (রা.)—যাঁকে রাসুলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত ভালোবাসতেন—সেই নারীর শাস্তি মওকুফের জন্য সুপারিশ করতে আসেন। এতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মোবারক রাগে লাল হয়ে যায় এবং তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন:

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ যখন তাদের মধ্যকার কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন কোনো দুর্বল সাধারণ মানুষ চুরি করত, তখন তারা তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর

কিতাবের কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিতাম।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৪৭৫)

৫.৩ সংখ্যালঘু ও অমুসলিমদের অধিকার (Rights of Minorities)

৫.৩.১ 'জিম্মি' চুক্তির আইনি নিরাপত্তা

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় অমুসলিম নাগরিকদের 'জিম্মি' (Dhimmis) বলা হয়, যার অর্থ হলো—যারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে নিজেদের জান, মাল এবং ইজ্জতের সুরক্ষার বিপরীতে রাষ্ট্রীয় জিম্মাদারিতে বা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। মদিনা রাষ্ট্রে অমুসলিমদের নাগরিক অধিকার কেবল কাগজের কলমে ছিল না, বরং তাদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে মুসলিমদের জন্য ঈমানের অংশ করা হয়েছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ অমুসলিম নাগরিকদের ওপর কোনো প্রকার জুলুম বা বৈষম্য করার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন:

"জেনে রেখো! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিভুক্ত অমুসলিম নাগরিকের (মুয়াহিদ/জিম্মি) ওপর জুলুম করবে, তার অধিকার খর্ব করবে, তার সাধের বাইরে তাকে কষ্ট দেবে অথবা তার সম্মতি ছাড়া তার কোনো সম্পত্তি কেড়ে নেবে—কিয়ামতের দিন আমি নিজে আদালতে সেই জালেম মুসলিমের বিরুদ্ধে বাদী হয়ে মামলা লড়ব।" (সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৩০৫২)

৫.৩.২ ধর্মীয় উপাসনালয়ের সুরক্ষা ও কর নীতি

মদিনা রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ব্যক্তিগত আইন (Personal Law) এবং ধর্মীয় বিধিবিধান রক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। খ্রিষ্টান বা ইহুদিরা তাদের নিজেদের ধর্মীয় আদালতের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক ও দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তি করতে পারত। তাদের উপাসনালয় যেমন গির্জা বা সিনাগগ ধ্বংস করা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

অমুসলিমদের কাছ থেকে সামরিক সুরক্ষার বিনিময়ে যে 'জিয্যা' (Jizyah) কর নেওয়া হতো, তা ছিল অত্যন্ত সামান্য এবং তা কেবল সক্ষম ও উপার্জনক্ষম পুরুষদের ওপর ধার্য করা হতো। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী এবং প্রতিবন্ধীরা এই কর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। এমনকি কোনো অমুসলিম নাগরিক যদি দরিদ্র হয়ে যেত, তবে রাষ্ট্র তার জিয্যা মওকুফ করত এবং উল্টো রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) থেকে তার জন্য ভাতার ব্যবস্থা করত।

৫.৪ অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (Economy & International Relations)

৫.৪.১ মদিনার বাজার সংস্কার ও রিবা-মুক্ত অর্থনীতি

হিজরতের আগে মদিনার পুরো অর্থনীতি ও বাজার ব্যবস্থা ছিল ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে, যা ছিল সুদ (Riba), ধোঁকা, মজুতদারি এবং চরম শোষণে জর্জরিত। রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আগমন করে প্রথমেই একটি স্বাধীন 'ইসলামিক মার্কেট' বা বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, এই বাজারে কোনো প্রবেশ মূল্য বা অন্যায় ট্যাক্স নেওয়া যাবে না, যাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সহজে ব্যবসা করতে পারে।

তিনি বাজার তদারকির জন্য 'মুহতাসিব' বা পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। তিনি নিজে বাজারে গিয়ে পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষা করতেন। একবার তিনি এক খাদ্য বিক্রেতার স্তূপ করা খাদ্যের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেখলেন যে ভেতরের খাদ্যগুলো ভেজা। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে বিক্রেতা বলল, "হে আল্লাহর রাসুল! বৃষ্টিতে এগুলো ভিজ়ে গিয়েছিল।" রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন: "তাহলে তুমি ভেজা অংশটা ওপরে রাখলে না কেন যাতে মানুষ দেখতে পেত? মনে রেখো, যে ব্যক্তি মানুষকে ধোঁকা দেবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০২)

৫.৫ মদিনা রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও দূত প্রেরণ

ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মদিনা রাষ্ট্র যখন একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পায়, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বিশ্বজনীন দাওয়াত ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিশ্বের বড় বড় পরাশক্তির সম্রাটদের কাছে চিঠি ও দূত প্রেরণ করেন।

করে বিশেষ দূত পাঠান। এই দূত প্রেরণের ক্ষেত্রে সমকালীন আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রথা (Diplomatic Immunity) কঠোরভাবে মেনে চলা হতো। শত্রুপক্ষের কোনো দূত মদিনায় আসলে তাকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হতো, এমনকি সে যদি চরম ধৃষ্টতাও দেখাত, তবুও তাকে হত্যা বা বন্দী করা হতো না।

৫.৬ ইসলামি যুদ্ধনীতি: মানবাধিকারের প্রথম সনদ

৫.৬.১ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও ডিফেন্সিভ স্ট্র্যাটেজি

ইসলামে যুদ্ধ (জিহাদ) কোনো সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, লুণ্ঠন বা জোরপূর্বক ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত নয়। মদিনা রাষ্ট্রের যুদ্ধনীতি ছিল মূলত আত্মরক্ষামূলক

(Defensive) এবং সমাজে চলমান জুলুম ও বিশৃঙ্খলা (ফিতনা) উচ্ছেদের জন্য ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো হচ্ছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তাদের ওপর জুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।" (সূরা আল-হজ, ২২:৩৯)

৫.৬.২ রণাঙ্গনের মানবিক আচরণবিধি

আধুনিক 'জেনেভা কনভেনশন' (Geneva Convention) প্রতিষ্ঠার শত শত বছর আগে রাসুলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের ময়দানে যে মানবিক আচরণবিধি ঘোষণা করেছিলেন, তা আজকের সভ্য দুনিয়ার জন্য এক পরম বিস্ময় । তিনি মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠানোর সময় যে নির্দেশনাবলি দিতেন, তা নিচে একটি কাঠামোগত তালিকার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

- **বৃদ্ধ, নারী ও শিশু সুরক্ষা:** যুদ্ধের মাঠে সরাসরি অংশগ্রহণ করেনি এমন কোনো বৃদ্ধ, নারী, শিশু বা বেসামরিক মানুষকে কোনো অবস্থাতেই হত্যা করা যাবে না ।
- **ধর্মীয় উপাসনালয় ও পুরোহিত:** অমুসলিমদের গির্জা, উপাসনালয় বা সিনাগগ ধ্বংস করা যাবে না এবং সেখানে উপাসনারত কোনো সন্ন্যাসী বা পুরোহিতকে আঘাত করা যাবে না ।
- **পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সম্পদ রক্ষা:** শত্রুপক্ষের কোনো ফলবান গাছ কাটা যাবে না, শস্যক্ষেত পুড়িয়ে দেওয়া যাবে না এবং গবাদিপশু অনর্থক জবাই করা যাবে না ।
- **যুদ্ধবন্দীদের সাথে মানবিক আচরণ:** বদরের যুদ্ধের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধবন্দীদের মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা বন্দীদের সাথে উত্তম আচরণ করো।" বন্দীদের নিজেরা যা খেতেন তা-ই খাওয়াতেন । এমনকি বন্দীদের মুক্তির জন্য কোনো অর্থ না থাকলে, কেবল মদিনার ১০টি শিশুকে অক্ষরজ্ঞান বা শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন ।

অধ্যায় সারাংশ

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনা কোনো কাল্পনিক বা থিওক্র্যাটিক সমাজব্যবস্থা ছিল না, বরং এটি ছিল একটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত, বহুত্ববাদী এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক মডেল। মদিনা সনদের মাধ্যমে তিনি যে শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তা প্রমাণ করে যে ধর্ম এবং রাজনীতি ইসলামের দুটি পরিপূরক অংশ এবং মানবজাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য একটি সুশাসিত রাষ্ট্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

অধ্যায় ৬: খুলাফায়ে রাশেদীন যুগ

অধ্যায় পরিচিতি

এই অধ্যায়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর ইসলামের প্রথম চার খলিফার (আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম) শাসনকাল, তাঁদের নেতৃত্ব নির্বাচনের গণতান্ত্রিক ও নৈতিক পদ্ধতি এবং তাঁদের প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কারসমূহ নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৬.১ আবু বকর (রা.): সংকট মোকাবেলা ও রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর মদিনা রাষ্ট্র যখন ধর্মত্যাগ (রিদ্বাহ), যাকাত অস্বীকারকারী এবং ভণ্ড নবীদের উত্থানে চরম অস্তিত্ব সংকটে পড়ে, তখন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এক দৃঢ় ও আপসহীন নেতৃত্ব প্রদান করেন। শূরার পরামর্শের ভিত্তিতে তিনি 'রিদ্বাহর যুদ্ধ' পরিচালনা করে মদিনা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর প্রথম ভাষণটি ছিল রাজনৈতিক জবাবদিহিতার এক অনন্য দলিল:

"হে মানুষ! আমি তোমাদের ওপর আমার নিযুক্ত হয়েছি, অথচ আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই। যদি আমি ভালো কাজ করি, তবে আমাকে সাহায্য করো; আর যদি আমি ভুল করি, তবে আমাকে সোজা করে দিও। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করব, তোমরা আমার আনুগত্য করো। আর যদি আমি তাঁদের نافرمانی

(অবাধ্যতা) করি, তবে আমার ওপর তোমাদের আনুগত্যের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।"

— আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৪৮

৬.২ উমর (রা.): প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক আধুনিকায়ন

হযরত উমর (রা.)-এর ১০ বছরের শাসনকাল ছিল ইসলামি খিলাফাতের স্বর্ণযুগ। তিনি মদিনা রাষ্ট্রকে একটি বিশাল সাম্রাজ্যে রূপান্তর করেন এবং আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপযোগী অসংখ্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন করেন:

- **দিওয়ান (Department) প্রতিষ্ঠা:** তিনি রাজস্ব বিভাগ, সামরিক বিভাগ এবং জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য পৃথক 'দিওয়ান' বা মন্ত্রণালয় গঠন করেন।
- **হিজরি সন প্রবর্তন:** দাপ্তরিক কাজের সুবিধার জন্য হিজরতকে কেন্দ্র করে নতুন পঞ্জিকা চালু করেন।
- **বায়তুল মালের সম্প্রসারণ:** সাধারণ নাগরিকদের জন্য নিয়মিত পেনশনের ব্যবস্থা চালু করেন, এমনকি অমুসলিম বৃদ্ধ ও অভাবী নাগরিকদের জন্যও রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ভাতার ব্যবস্থা করেন।
- **রাতে টহল (Night Patrol):** জনগণের দুঃখ-কষ্ট সচক্ষে দেখার জন্য তিনি রাতে ছদ্মবেশে মদিনার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতেন।

৬.৩ উসমান (রা.): অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কুরআন সংকলন

হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনকালের প্রথমার্ধে খিলাফাতের সীমানা আরও বিস্তৃত হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে রাষ্ট্র চরম সমৃদ্ধি লাভ করে। তাঁর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ও দ্বীনি অবদান ছিল সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য কুরআনের একটি প্রমিত কপি (মুসহাফে উসমানি) তৈরি করে তা বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো, যা উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ঐক্য ধরে রাখতে সাহায্য করেছিল। তিনি প্রথম ইসলামি নৌবাহিনী (Navy) গঠন করেন।

৬.৪ আলী (রা.): অভ্যন্তরীণ সংকট ও ন্যায়বিচার

হযরত আলী (রা.)-এর শাসনকাল ছিল অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ফিতনা ও গৃহযুদ্ধে জর্জরিত। তা সত্ত্বেও তিনি খিলাফাতের কেন্দ্রীয় আদর্শ ও ইনসাফের নীতি থেকে এক চুলও বিচ্যুত হননি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় তিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও নিজের একটি বর্ম চুরির মামলায় তিনি সাধারণ ইহুদি নাগরিকের বিরুদ্ধে কাজী শুরাইহ-এর আদালতে উপস্থিত হন এবং পর্যাপ্ত প্রমাণ

না থাকায় কাজি যখন খলিফার বিপক্ষে রায় দেন, তখন তিনি তা সানন্দে মেনে নেন। খলিফার এই ইনসাফ দেখে উক্ত ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৬.৫ খুলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বের আদর্শ ও জবাবদিহিতা

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নেতৃত্বের মূল ভিত্তি ছিল ‘তাকওয়া’ বা আল্লাহর ভয় এবং জনগণের কাছে পূর্ণ জবাবদিহিতা। খলিফাগণ নিজেদের জনগণের শাসক নয়, বরং সেবক মনে করতেন। তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সাধারণ। তাঁরা সাধারণ মানুষের মতোই হাটে-বাজারে চলতেন এবং জুমার খুতবায় যে কেউ তাঁদের পোশাক বা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলতে পারত।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই সৎকর্মপরায়ণ শাসকদের ব্যাপারে বলেন:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে।” — সূরা আল-হাজ্জ (২২:৪১)

৬.৬ উমর (রা.)-এর প্রশাসনিক সংস্কার: একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ

হযরত উমর (রা.)-এর শাসনকালকে কেন 'আইনের শাসনের' আদর্শ ধরা হয়, তার কিছু বিশেষ ক্ষেত্র এখানে আলোচনা করা হলো:

- বিভাগীয় প্রশাসন (Provincial Administration): তিনি সমগ্র খিলাফাতকে মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, কুফা, বসরা, ফিলিস্তিন ও মিশর—এই আটটি প্রধান প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। প্রতিটি প্রদেশে একজন গভর্নর (ওয়ালি), একজন আমিল (রাজস্ব কর্মকর্তা), একজন কাজি (বিচারক) এবং একজন কাতিব (সচিব) নিযুক্ত ছিলেন।
- জনশুমারি ও পেনশন ব্যবস্থা: তিনিই প্রথম রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের নাম ও প্রয়োজনের তালিকা তৈরি করেন। নবজাতক শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাতার প্রবর্তন করেন।
- পুলিশ বিভাগ (আহদাস): জনগণের জানমালের সুরক্ষার জন্য তিনি প্রথম নিয়মিত নৈশপ্রহরী ও পুলিশ বাহিনী গঠন করেন।

৬.৭ জবাবদিহিতার এক অনন্য উদাহরণ

একবার হযরত উমর (রা.) জুমার খুতবা দিতে দাঁড়ালে একজন সাধারণ নাগরিক দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, "হে খলিফা, আমাদের সবাইকে বায়তুল মাল থেকে একটি করে চাদর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনি লম্বা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আপনার গায়ে দুটি চাদর দেখা যাচ্ছে কেন? আপনি এই বাড়তি কাপড় কোথায় পেলেন?" খলিফা উমর (রা.) নিজে উত্তর না দিয়ে তাঁর ছেলেকে উত্তর দিতে বললেন। তাঁর ছেলে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার আব্বাকে যে চাদর দেওয়া হয়েছিল তা তাঁর জন্য ছোট ছিল, তাই আমি আমার চাদরটি তাঁকে দিয়েছি।" এই হলো খিলাফাতের জবাবদিহিতা।

অধ্যায় সারাংশ

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ছিল নবুয়তের আদলে খিলাফাতের (Khilafah ala Minhaj an-Nubuwwah) বাস্তব রূপ। এই যুগের চারজন খলিফাই দেখিয়েছেন কীভাবে একটি বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেও ব্যক্তিগত সততা, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ (শূরা) অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

অধ্যায় ৭: শূরা ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য (Shura vs. Democracy)

অধ্যায় পরিচিতি

আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালনার সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল চর্চিত শাসনতান্ত্রিক মতবাদ হলো 'গণতন্ত্র' (Democracy)। অন্যদিকে, ইসলামি শাসনব্যবস্থার আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল চালিকাশক্তি হলো 'শূরা' বা পারস্পরিক পরামর্শ ব্যবস্থা (System of Shura)। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনেকের কাছে এই দুটি পদ্ধতিকে একই রকম মনে হতে পারে—যেহেতু উভয় পদ্ধতিতেই একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সামষ্টিক মতামতের ওপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু আদর্শিক ভিত্তি, সার্বভৌমত্বের উৎস, আইনের সীমাবদ্ধতা এবং প্রয়োগিক দর্শনের দিক থেকে শূরা এবং আধুনিক গণতন্ত্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা এই দুটি ব্যবস্থার মৌলিক ও তাত্ত্বিক পার্থক্যসমূহ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করব।

৭.১ শূরার সংজ্ঞা, দার্শনিক ভিত্তি ও কুরআনিক নির্দেশনা

'শূরা' (Shura) একটি আরবি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হলো—কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিদের পারস্পরিক পরামর্শ করা, মতামত আদান-প্রদান করা এবং কোনো বিষয়ে সর্বোত্তম সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তায় শূরা কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং এটি খিলাফাত রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান একটি আইনি স্তম্ভ (Constitutional Pillar)।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুমিনদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে শূরার উল্লেখ করেছেন:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“এবং যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, এবং যাদের সমস্ত কাজ পারস্পরিক পরামর্শের (শূরার) ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়; আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।”

— সূরা আশ-শূরা (৪২:৩৮)

এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ হওয়া সত্ত্বেও, উম্মাহকে পরামর্শের গুরুত্ব শেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ করো। তারপর যখন তুমি কোনো সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো।”

— সূরা আল-ইমরান (৩:১৫৯)

৭.২ শূরা ও গণতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্যসমূহ (The Structural Dissimilarities)

শূরা এবং গণতন্ত্রের মধ্যকার গুণগত ও কাঠামোগত পার্থক্যগুলোকে প্রধানত কয়েকটি মূল বিষয়ের আলোকে নিচে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. সার্বভৌমত্বের উৎস (Source of Sovereignty):

- **গণতন্ত্রে:** গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস" (Popular Sovereignty)। এখানে আইন সভার বা পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যদি কোনো অনৈতিক বা প্রাকৃতিক নিয়ম-বহির্ভূত বিষয়কেও আইন হিসেবে পাস করে, তবে তা-ই চূড়ান্ত আইন বলে গণ্য হয় (যেমন সমকামিতার বৈধতা বা সুদের আইনি স্বীকৃতি)।
- **শূরায়:** ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর (Divine Sovereignty)। শূরার সদস্যরা বা মজলিসে শূরা কোনো নতুন মৌলিক আইন তৈরি করতে পারে না যা কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধানের (নস) পরিপন্থী। শূরার কাজ হলো—আল্লাহর দেওয়া আইনের বাস্তবায়ন পদ্ধতি খুঁজে বের করা এবং যেখানে স্পষ্ট কোনো টেক্সট বা ওহী নেই, সেখানে ইজতিহাদের মাধ্যমে শরিয়াহর সীমানার ভেতরে থেকে উপ-আইন বা প্রশাসনিক নীতিমালা তৈরি করা।

২. সংখ্যার জোর বনাম যোগ্যতার মানদণ্ড (Quantity vs. Quality):

- **গণতন্ত্রে:** গণতন্ত্রে সংখ্যার প্রাধান্যই শেষ কথা (Rule of Majority)। এখানে একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী, একজন পরম সৎ আলিম এবং একজন দাগী অপরাধী বা নিরক্ষর মানুষের ভোটের মূল্য সমান। বিখ্যাত দার্শনিক আল্লামা ইকবাল গণতন্ত্রের এই ত্রুটিকে ইঙ্গিত করে তাঁর ফারসি কবিতায় বলেছিলেন: *"গণতন্ত্র হলো এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে কেবল মাথা গণনা করা হয়, মাথার ভেতরের মগজ বা প্রজ্ঞা পরিমাপ করা হয় না।"*
- **শূরায়:** ইসলামি শূরা ব্যবস্থায় যেকোনো সাধারণ মানুষকে শূরার সদস্য বা নীতিনির্ধারক বানানো হয় না। শূরার সদস্যদের বলা হয় 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (أهل الحل والعقد) বা 'সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তিবর্গ'। এদের মধ্যে গভীর আইনি জ্ঞান (ইজতিহাদ), প্রজ্ঞা, সততা, খোদাভীতি এবং

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (যেমন অর্থনীতি, সামরিক বা চিকিৎসা) বিশেষ দক্ষতা থাকা বাধ্যতামূলক।

গণতন্ত্র	শূরা
জনগণই চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস।	একমাত্র আল্লাহই সার্বভৌম।
সংখ্যাগরিষ্ঠের সংখ্যাই (Quantity) প্রধান।	প্রজ্ঞা ও যোগ্যতাই (Quality) মূল।
শরিয়াহর যেকোনো বিধান পরিবর্তন সম্ভব।	কুরআন-সুন্নাহর সীমানা অলঙ্ঘনীয়।

৩. আইন প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা (Jurisdiction of Legislation):

- **গণতন্ত্রে:** ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে কোনো 'পবিত্র বা অলঙ্ঘনীয়' সীমানা নেই। মানুষের চাহিদা ও বৈশ্বিক রাজনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে যেকোনো নৈতিক মূল্যবোধকে বদলে ফেলা সম্ভব।
- **শূরায়:** শূরার কাজের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ—মজলিসে শূরা কখনো ভোট খসড়া করে মদ্যপান, জুয়া বা সুদকে হালাল করতে পারবে না, কারণ এগুলো আল্লাহ কর্তৃক চিরতরে হারাম। তবে রাষ্ট্র কীভাবে যাকাত সংগ্রহ করবে, ট্রাফিক জ্যাম কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে, বা আধুনিক সাইবার অপরাধের জন্য কী প্রশাসনিক শাস্তি (তা'জির) দেওয়া হবে—এইসব উন্মুক্ত ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শূরা পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে কাজ করে।

৭.৩ মজলিসে শূরা বনাম আধুনিক পার্লামেন্ট (Comparative Case Study)

আধুনিক যুগের একটি গণতান্ত্রিক সংসদ বা পার্লামেন্টের সাথে খিলাফাতের 'মজলিসে শূরা'র প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলীর ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক তুলনা নিচে একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামোগত টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

তুলনার বিষয়সমূহ	আধুনিক গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট	ইসলামি খিলাফতের মজলিসে শূরা
------------------	--------------------------------	-----------------------------

মূল লক্ষ্য	দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়ন ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা।	আল্লাহর জমিনে ইনসাফ ও শরিয়াহর সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
সদস্যদের চরিত্র	রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত, অনেক সময় পেশীশক্তি বা অর্থের জোরে নির্বাচিত।	সততা, খোদাভীতি এবং জনগণের মাঝে গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে মনোনীত (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ)।
সিদ্ধান্তের ভিত্তি	দলীয় হুইপ এবং অন্ধ দলীয় আনুগত্য (Party Line)।	সত্যের অনুসন্ধান, কুরআন-সুন্নাহর দলিল ও মুক্ত বিবেক।
সংখ্যালঘুর সুরক্ষার নিশ্চয়তা	সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, যা যেকোনো সময় খর্ব হতে পারে।	আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী অধিকার, যা কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েও কেড়ে নেওয়া অসম্ভব।
শাসকের ওপর নিয়ন্ত্রণ	বিরোধী দলের রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি ও অনাস্থা প্রস্তাবের ভয়।	খলিফাকে সরাসরি প্রশ্ন করার ঐশ্বরিক অধিকার ও কঠোর প্রশাসনিক জবাবদিহিতা।

৭.৪ খলিফা ও শূরার পারস্পরিক সম্পর্কের আইনি রূপ

ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি বড় বিতর্ক হলো—শূরার সিদ্ধান্ত খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান মানতে বাধ্য কি না (هل الشورى معطمة أم ملزمة)। ধ্রুপদী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ যেমন ইমাম মাওয়াদি এবং আধুনিক ফকিহগণের মতে, খিলাফাত ব্যবস্থায় খলিফা স্বেচ্ছাচারী নন।

- শূরার সদস্যরা যদি কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে ঐকমত্যে (ইজমা) পৌঁছান, তবে খলিফা তা মেনে নিতে সম্পূর্ণ বাধ্য।
- যদি কোনো বিষয়ে শূরার সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতভেদ তৈরি হয়, তবে খলিফা উভয় পক্ষের দলিলসমূহ পর্যালোচনা করে উম্মাহর জন্য যেটি সবচেয়ে কল্যাণকর ও শরিয়াহসম্মত, সেই মতটিকে গ্রহণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (আযম) নেবেন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করবেন। এটি খিলাফাত রাষ্ট্রকে যেমন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে রক্ষা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি একনায়কত্বের পথকেও চিরতরে বন্ধ করে দেয়।

অধ্যায় ৮: ইসলামি অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি

অধ্যায় পরিচিতি

একটি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও জনকল্যাণ তার অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করে। এই অধ্যায়ে ইসলামি রাষ্ট্রনীতির অর্থনৈতিক স্তম্ভসমূহ, যেমন—যাকাত ব্যবস্থা, বায়তুল মালের কার্যকারিতা, সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং কীভাবে ইসলামি রাষ্ট্রনীতি সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন ও সুখম সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করে, তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮.১ যাকাত: সামাজিক নিরাপত্তার মূল ভিত্তি

যাকাত কেবল একটি ধর্মীয় ইবাদত নয়, বরং এটি ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রীয় কর ব্যবস্থা। ধনী ব্যক্তিদের উদ্বৃত্ত সম্পদের ওপর নির্দিষ্ট হারে (২.৫%) এই হক নির্ধারণ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা রাষ্ট্রপ্রধানকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে বলেন:

“خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا” “তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করো, এর মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে।” — সূরা আত-

তাওবাহ (৯:১০৩)

যাকাত ব্যবস্থার মূল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হলো সম্পদ যেন সমাজে কেবল ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। আল্লাহ বলেন:

“كَيِّ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ” “যাতে সম্পদ তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।” — সূরা আল-হাশর (৫৯:৭)

৮.২ বায়তুল মাল (State Treasury)

খিলাফাত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে ‘বায়তুল মাল’ বলা হয়। এটি কোনো শাসকের ব্যক্তিগত তহবিল নয়, বরং এটি জনগণের সম্পত্তি। এর আয়ের উৎসগুলো হলো: যাকাত, উশর (ফসলের কর), খরাজ (ভূমির কর), জিযয়া এবং খুমুস (খনিজ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ)। বায়তুল মালের অর্থ প্রথমে সমাজের দরিদ্র, এতিম, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে ব্যয় করা হয়, যা একটি আধুনিক Welfare State বা কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৮.৩ সুদবিরোধী (Riba-free) অর্থনীতি ও নৈতিক বাজার ব্যবস্থা

ইসলামি রাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক পদক্ষেপ হলো সমস্ত অর্থনৈতিক লেনদেন থেকে সুদ বা ‘রিবা’ সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা। সুদ সমাজকে শোষণ, কৃত্রিম মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকে ঠেলে দেয়।

পবিত্র কুরআনে সুদের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন করো, যদি তোমরা মুমিন হও। আর যদি তোমরা তা না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা জেনে নাও।” — সূরা আল-বাকার (২:২৭৮-২৭৯) হাদিস শরিফেও সুদের সাথে জড়িত সবার প্রতি অভিশাপ দেওয়া হয়েছে:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ جَابِرِ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “রাসুলুল্লাহ ﷺ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার সাক্ষীদ্বয়ের ওপর লানত (অভিশাপ) করেছেন এবং বলেছেন, তারা সবাই সমান অপরাধী।” — সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: মুসাকাত, হাদিস নং ১৫৯৮

৮.৪ দরিদ্র বিমোচন ও সম্পদ বণ্টন: ঐতিহাসিক কেস স্টাডি

ইসলামি অর্থনীতির কার্যকারিতার সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-এর শাসনকালে (৯৯-১০১ হিজরি)। তাঁর ২.৫ বছরের ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক নীতি ও সুষম সম্পদ বণ্টনের ফলে খিলাফতের এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, যাকাতের টাকা নিয়ে দাতা ঘুরে বেড়াতেন কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো একজন দরিদ্র মানুষও খুঁজে পাওয়া যেত না।

৮.৫ আধুনিক ইসলামি ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ পদ্ধতি

বর্তমান বিশ্বে ইসলামি শাসনব্যবস্থা না থাকলেও ইসলামি অর্থনীতি বা ‘Islamic Finance’ একটি বড় জায়গা দখল করে নিয়েছে। এর প্রধান পদ্ধতিগুলো হলো:

- **মুদারাবাহ (Mudarabah):** এক পক্ষ পুঁজি দেবে, অন্য পক্ষ শ্রম ও মেধা দেবে; লভ্যাংশ বণ্টন হবে পূর্বচুক্তি অনুযায়ী।
- **মুশারাকাহ (Musharakah):** যৌথ মালিকানায় ব্যবসা, যেখানে লাভ ও লোকসান উভয় পক্ষ বহন করে।
- **মুরাবাহা (Murabaha):** পণ্যের ক্রয়মূল্য ও লভ্যাংশ উল্লেখ করে বাকিতে বিক্রয়।

৮.৬ মজুতদারি ও বাজার কারসাজির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান

ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে ‘এহতিকার’ বা কৃত্রিমভাবে সংকট তৈরির জন্য খাদ্যপণ্য মজুত রাখা হারাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا يَحْتَكَرُ إِلَّا خَاطِئٌ "পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া কেউ মজুতদারি করে না।" — সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৬০৫

অধ্যায় সারাংশ

ইসলামি অর্থনীতি কোনো পুঁজিবাদী শোষণ বা সমাজবাদী জোরজুলুমের ব্যবস্থা নয়। এটি একটি নৈতিক ও মানবিক অর্থনীতি, যা একদিকে ব্যক্তিকে সৎ উপায়ে সম্পদ অর্জনের স্বাধীনতা দেয়, অন্যদিকে যাকাত ও সুদহীন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে ইনসাফ ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

অধ্যায় ৯: ইসলামি বিচারব্যবস্থা ও মানবাধিকার

অধ্যায় পরিচিতি

একটি রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড হলো তার বিচারব্যবস্থা। এই অধ্যায়ে শরিয়াহর আইনি কাঠামো, আদালতে ইনসাফের প্রয়োগ, ইসলামে মানবাধিকারের স্বরূপ এবং বিশেষ করে নারী ও অমুসলিম নাগরিকদের আইনি সুরক্ষার বিষয়টি ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৯.১ শরিয়াহ ও আদালত ব্যবস্থা

ইসলামি বিচারব্যবস্থার মূল উৎস হলো শরিয়াহ (কুরআন ও সুন্নাহ)। এখানে বিচারক বা ‘কাজি’ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করেন; এমনকি খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানও বিচারকের ওপর কোনো রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারেন না।

আদালতে সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।” — সূরা আন-নিসা (৪:৫৮)

শত্রুতার কারণেও যেন কেউ ইনসাফ থেকে বিচ্যুত না হয়, সে বিষয়ে কুরআন কঠোর নির্দেশ দিয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়পদ থাকো এবং সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ বর্জনে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ করো, এটা তাকওয়ার নিকটতর।” —

সূরা আল-মায়দাহ (৫:৮)

৯.২ মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার

আধুনিক বিশ্বে ১৯৪৮ সালের ‘মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা’ (UDHR)-কে মানবাধিকারের ভিত্তি ধরা হলেও, রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের ভাষণে (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) মানবজাতির মৌলিক অধিকারের যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা আজও অতুলনীয়।

তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

“নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের ইজ্জত-আব্রু একে অপরের জন্য পবিত্র ও হারাম (লঙ্ঘন অযোগ্য); যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহর।” — সহিহ বুখারি, অধ্যায়: হজ, হাদিস নং ১৭৩৯

৯.৩ নারী ও অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার

- **নারীর অধিকার:** ইসলামি শাসনব্যবস্থায় নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (মোহরানা ও উত্তরাধিকারের মালিকানা), শিক্ষার অধিকার এবং আইনি সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “নারীরা হলো পুরুষদের সহোদর তুল্য।” (সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ২৩৬)।
- **অমুসলিমদের অধিকার:** ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের নিজস্ব ধর্মীয় আইন অনুযায়ী বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাদের উপাসনালয় (গির্জা, মন্দির, সিনাগগ) ধ্বংস করা রাষ্ট্রীয় আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। হযরত উমর (রা.) জেরুজালেম বিজয়ের পর সেখানকার খ্রিষ্টানদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, তা অমুসলিমদের ধর্মীয় ও নাগরিক সুরক্ষার এক ঐতিহাসিক দলিল।

অধ্যায় সারাংশ

ইসলামি বিচারব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো ‘সামাজিক ন্যায়বিচার’ কায়েম করা। এখানে আইন সবার জন্য সমান—তা সে রাষ্ট্রের খলিফাই হোক বা সাধারণ কোনো নাগরিক। এই নিরপেক্ষ বিচারিক ব্যবস্থাপনাই সমাজে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনে।

অধ্যায় ১০: বর্তমান গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সাথে তুলনা

অধ্যায় পরিচিতি

এই অধ্যায়ে বর্তমান বিশ্বের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র (Socialism) ও পুঁজিবাদ (Capitalism)-এর দার্শনিক ভিত্তি এবং তাদের সীমাবদ্ধতাসমূহ বিশ্লেষণ করে তার বিপরীতে ইসলামি খিলাফাত ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও ভারসাম্যপূর্ণ রূপটি তুলে ধরা হয়েছে।

১০.১ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সংকট

- **পুঁজিবাদ (Capitalism):** পুঁজিবাদের মূল কথা হলো ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা এবং মুনাফা লাভ। এর ফলে সমাজে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয় এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়। বর্তমান বিশ্বের ১% মানুষের কাছে যে সম্পদ রয়েছে, তা বাকি ৯৯% মানুষের যৌথ সম্পদের চেয়েও বেশি—এটি পুঁজিবাদেরই চরম ব্যর্থতা।
- **সমাজতন্ত্র (Socialism):** পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা কেড়ে নিয়ে সবকিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার কথা বলা হয়। এটি মানুষের সহজাত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও কাজের উদ্দীপনাকে ধ্বংস করে দেয়, যার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো বিশাল অর্থনৈতিক পরাশক্তিও ভেঙে পড়ে।

১০.২ ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থা (The Middle Path)

ইসলাম এই দুই চরমপন্থার বিপরীতে একটি সুন্দর মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। ইসলাম একদিকে যেমন পুঁজিবাদের মতো ব্যক্তিকে সৎ উপায়ে সম্পদ অর্জনের ও মালিকানার অধিকার দেয়, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের মতো রাষ্ট্রীয় তদারকি ও যাকাত-সদকার মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জাতি হিসেবে অভিহিত করে বলেন:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“আর এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতি (ভারসাম্যপূর্ণ উম্মাহ) বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও এবং রসূল হন তোমাদের ওপর সাক্ষী।” —

সূরা আল-বাকারা (২:১৪৩)

১০.৩ পশ্চিমা রাজনৈতিক দর্শনের সীমাবদ্ধতা ও বৈশ্বিক সংকট

বর্তমান বিশ্ব যে রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকটের মুখোমুখি, তার মূল কারণ হলো পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) রাজনৈতিক দর্শন। এই দর্শনে রাজনীতিকে নৈতিকতা ও ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এখন ন্যায়বিচারের ওপর নয়, বরং ‘জোর যার মুলুক তার’ (Might is Right) নীতির ওপর পরিচালিত হচ্ছে। জাতিসংঘের ভেটো পাওয়ার ব্যবস্থা এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ, যেখানে শক্তিশালী দেশগুলো নিজেদের স্বার্থে দুর্বল দেশগুলোর ওপর অন্যায় চাপিয়ে দিচ্ছে।

অধ্যায় সারাংশ

গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র মানুষের তৈরি সাময়িক মতবাদ যা মানবজাতির সম্পূর্ণ কল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র স্রষ্টা প্রদত্ত ইসলামি খিলাফাত ব্যবস্থাপনাই মানুষের আত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম।

অধ্যায় ১১: খিলাফাত ব্যবস্থা আধুনিক বিশ্বে কতটা প্রযোজ্য?

অধ্যায় পরিচিতি

অনেকে মনে করেন খিলাফাত কেবল অতীতের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, আধুনিক যুগে এর কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব নয়। এই অধ্যায়ে নেশন-স্টেট (জাতিরাষ্ট্র)-এর সীমাবদ্ধতা, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে ইসলামি প্রশাসনের রূপরেখা এবং একবিংশ শতাব্দীতে খিলাফাতের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১ Nation State বনাম বিশ্বজনীন উম্মাহ ধারণা

বর্তমান বিশ্ব ‘জাতিরাষ্ট্র’ (Nation-State) কাঠামোয় বিভক্ত, যা মূলত ভৌগোলিক সীমানা, ভাষা বা জাতিগত পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়াবহ বিপর্যয়ের জন্ম দিয়েছে।

ইসলাম এই ভৌগোলিক সীমারেখাকে ভেঙে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও একতাবদ্ধ ‘উম্মাহ’র ধারণা দেয়। ইসলামি রাষ্ট্রনীতি কোনো নির্দিষ্ট গোত্র বা ভৌগোলিক অঞ্চলের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আদর্শ। আব্বাসী কালখান আল-আমিন বলেন:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মাহ তো একক এক উম্মাহ (জাতি) এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত করো।” — সূরা আল-আন্বা (২১:৯২)

১১.২ প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে ইসলামি প্রশাসন (E-Governance & AI)

খিলাফাত মানেই সপ্তম শতাব্দীর উটের যুগে ফিরে যাওয়া নয়। খিলাফাত হলো একটি ‘মূলনীতি’ (Framework), আর প্রযুক্তি হলো একটি ‘মাধ্যম’ (Tools)। আধুনিক যুগে একটি ইসলামি রাষ্ট্র ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত বায়তুল মাল (কোষাগার) পরিচালনা করতে পারে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এবং বিগ ডাটা ব্যবহার করে শূরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত ও নির্ভুল করা সম্ভব। ইসলামি আইনের মূল লক্ষ্য (Maqasid al-Shariah)—যেমন জীবন, সম্পদ, বংশ ও মেধার সুরক্ষা—আধুনিক সাইবার সিকিউরিটি ও ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে আরও দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

১১.৩ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বৈষম্য ও জলবায়ু সংকটের সমাধান

বর্তমান বিশ্বের প্রধান দুটি সমস্যা হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং পরিবেশ বিপর্যয়।

- **অর্থনৈতিক বৈষম্য:** আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) বা বিশ্বব্যাংকের সুদের জালে আটকে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ইসলামি সুদবিহীন কর্মমুক্ত অর্থব্যবস্থা এবং করপোরেট সুকুক (Sukuk) বন্ডের মাধ্যমে মুক্তি দেওয়া সম্ভব।
- **পরিবেশ নীতি:** ইসলাম পরিবেশ সুরক্ষাকে ইবাদতের অংশ করেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যদি তোমরা জানো যে আগামীকাল কিয়ামত হবে, তবুও আজ একটি গাছের চারা রোপণ করো।” (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১২৯৮১)। এই নৈতিক রাষ্ট্রনীতি আধুনিক জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

অধ্যায় সারাংশ

একবিংশ শতাব্দীর জটিল বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধান আধুনিক সেক্যুলার মডেলগুলো দিতে পারছে না। খিলাফাত ব্যবস্থা কোনো প্রাচীন অপ্রাসঙ্গিক মডেল নয়, বরং এর মূলনীতিগুলো আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে প্রয়োগ করলে তা বর্তমান বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর ও বাস্তবসম্মত প্রমাণিত হবে।

অধ্যায় ১২: ইসলামি শাসনব্যবস্থা নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা

অধ্যায় পরিচিতি

বর্তমান বৈশ্বিক গণমাধ্যম ও ভূ-রাজনীতির কারণে ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফাত সম্পর্কে নানা ধরনের নেতিবাচক অপপ্রচার ও ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। এই অধ্যায়ে উগ্রবাদ, মানবাধিকার, নারী অধিকার এবং ইসলামোফোবির মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর পেছনের অপপ্রচার ও প্রকৃত সত্য উন্মোচন করা হয়েছে।

১২.১ মিডিয়া প্রোপাগান্ডা ও ইসলামোফোবিয়া (Islamophobia)

পাশ্চাত্যের মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো প্রায়শই খিলাফাত শব্দটিকে উগ্রবাদ, সহিংসতা এবং অনুন্নত ব্যবস্থার সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করে। কোনো কোনো উগ্রপন্থী গোষ্ঠী ইসলামের নাম ব্যবহার করে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায়, তাকে ইসলামের খিলাফাত ব্যবস্থার আসল রূপ বলে প্রচার করা হয়। অথচ ইসলামের রাষ্ট্রনীতি কোনো চরমপন্থা বা নিরীহ মানুষের ওপর রক্তপাত সমর্থন করে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করল—অন্য কোনো হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া বা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়া—সে যেন সমস্ত মানবজাতিকেই হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি কোনো মানুষের প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সমস্ত মানবজাতির প্রাণ রক্ষা করল।” — সূরা আল-মায়দাহ (৫:৩২)

১২.২ নারীর অধিকার ও আধুনিক বিভ্রান্তি

ইসলামোফোবিক প্রচারণায় দাবি করা হয় যে ইসলামি রাষ্ট্রে নারীদের চার দেয়ালের মাঝে বন্দি রাখা হয় এবং তাদের অধিকার খর্ব করা হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামি রাষ্ট্রে নারীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে (শূরায়) অংশ নিতে পারেন। হযরত উমর (রা.) তাঁর শাসনকালে মদিনার বাজার তদারকি ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য ‘শিফা বিনতে আবদুল্লাহ’ নামক এক প্রাজ্ঞ নারীকে নিযুক্ত করেছিলেন, যা প্রমাণ করে যে যোগ্যতা অনুযায়ী নারীদের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অধ্যায় সারাংশ

উগ্রবাদী গোষ্ঠীর অপকর্ম বা পশ্চিমা মিডিয়ার পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারণার মাধ্যমে ইসলামের রাষ্ট্রচিন্তাকে মূল্যায়ন করা অনুচিত। কুরআন, সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রকৃত ইতিহাস অধ্যয়ন করলেই স্পষ্ট হয় যে ইসলামি শাসনব্যবস্থা মূলত মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারের শ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি।

অধ্যায় ১৩: ভবিষ্যৎ বিশ্ব ও ইসলামি নেতৃত্ব

অধ্যায় পরিচিতি

বইয়ের চূড়ান্ত অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ বিশ্বব্যবস্থায় ইসলামের ইতিবাচক ভূমিকা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশনের যুগে নৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং একটি সুন্দর পৃথিবী গঠনে তরুণ প্রজন্মের করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩.১ AI এবং প্রযুক্তির যুগে নৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

ভবিষ্যৎ পৃথিবী প্রযুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু প্রযুক্তি যদি নৈতিকতাহীন মানুষের হাতে থাকে, তবে তা পারমাণবিক যুদ্ধ, সাইবার নজরদারি এবং মানুষের দাসত্বের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এখানেই ইসলামের ‘তাকওয়া’ বা খোদাভীতি ভিত্তিক নেতৃত্বের প্রাসঙ্গিকতা। একজন মুসলিম নেতা প্রযুক্তিকে মানব ধ্বংসের কাজে নয়, বরং আল্লাহর সৃষ্টির সেবায় ব্যবহার করবেন। কারণ তিনি জানেন, প্রযুক্তির প্রতিটি গোপন ব্যবহারের জন্যও তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

১৩.২ ভবিষ্যৎ বিশ্বব্যবস্থায় ইসলামের ভূমিকা

বর্তমান পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে এক চরম মানসিক হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষ এখন শান্তি ও জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজছে। ইসলামি জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রনীতি ভবিষ্যৎ বিশ্বকে কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেবে না, বরং একটি আত্মিক ও নৈতিক আশ্রয়স্থল প্রদান করবে, যেখানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের মানবিক মূল্যবোধেরও বিকাশ ঘটবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যৎ বিশ্বব্যবস্থায় ইনসাফের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ... ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ ۝

হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তোমাদের মাঝে নবুয়ত থাকবে যতদিন আল্লাহ চান... এরপর (রাজতন্ত্র ও জুলুমের শাসনের পর) পুনরায় নবুয়তের আদলে খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত হবে।” — মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৮৪৩০; বায়হাকি (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ৫৩৭৮, সানাদ সহিহ)

অধ্যায় সারাংশ

ভবিষ্যৎ পৃথিবী তরবারির জোরে নয়, বরং নৈতিক আদর্শ, উন্নত চরিত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং অর্থনৈতিক ইনসাফের মাধ্যমে জয় করতে হবে। তরুণ প্রজন্ম যদি ইসলামের এই শাস্ত্রত রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রশাসনিক কাঠামো সঠিকভাবে বুকে ধারণ করে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে, তবে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যৎ বিশ্বব্যবস্থায় ইসলামই হবে মানবজাতির মুক্তির একমাত্র আলোকবর্তিকা।

অধ্যায় ১৪: ইসলামি শাসনব্যবস্থায় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি নীতি (বিস্তারিত বিশ্লেষণ)

১৪.১ শিক্ষার রাষ্ট্রীয় বাধ্যতামূলককরণ ও দর্শন

ইসলামি রাষ্ট্রে শিক্ষা কেবল একটি মৌলিক অধিকার নয়, বরং এটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। ইসলামি রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিতে, একটি অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জাতি কখনো আল্লাহর খিলাফাতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো—মানুষকে স্রষ্টার পরিচয় করানো, নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা এবং পার্থিব জীবনের কল্যাণ সাধনে যোগ্য করে তোলা।

পবিত্র কুরআনের প্রথম বাণীই ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত:

“إِذَا فَرَأَىٰ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ” পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।” — সূরা আল-আলাক (৯৬:১)

হাদিস শরিফেও জ্ঞানার্জনকে সর্বোচ্চ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে:

আনাস ʿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।” — সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২২৪

রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মসজিদের নববীর বারান্দায় ‘আহলে সুফফাহ’ নামক প্রথম রাষ্ট্রীয় আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর তিনি যুদ্ধবন্দীদের জন্য এক অনন্য মুক্তিপণ নীতি ঘোষণা করেন। যেসকল কুরাইশ বন্দী লিখতে ও পড়তে জানতেন, তাঁদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, তাঁরা ১০ জন মুসলিম শিশুকে অক্ষরজ্ঞান দান করবেন। এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে শিক্ষার প্রসারে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের এক কালজয়ী উদাহরণ।

১৪.২ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ ও খিলাফাতের প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা

আব্বাসীয় খিলাফাত (বিশেষ করে খলিফা হারুন আল-রশিদ এবং মামুন আল-রশিদের শাসনকাল) এবং স্পেনের কর্ডোভা খিলাফাতের যুগকে বিশ্ব ইতিহাসের ‘জ্ঞানের স্বর্ণযুগ’ (Islamic Golden Age) বলা হয়। খিলাফাত ব্যবস্থা বিজ্ঞান ও ধর্মকে মুখোমুখি দাঁড় করায়নি, বরং বিজ্ঞানকে স্রষ্টার সৃষ্টিজগত বোঝার একটি মাধ্যম হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রমোট করেছে।

- **বাইতুল হিকমাহ (House of Wisdom):** খলিফা মামুন আল-রশিদ বাগদাদে এই বিশ্ববিখ্যাত একাডেমি ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। সমকালীন বিশ্বের গ্রিক, পারস্য, রোমান ও ভারতীয় দর্শনের বইগুলো রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে আরবিতে অনুবাদ করা হতো। অনেক সময় অনূদিত বইয়ের ওজনের সমপরিমাণ সোনা অনুবাদকদের পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হতো।
- **বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের উত্থান:**
 - **আল-খাওয়ারিজমি:** খিলাফাতের গবেষণাগারে বসেই তিনি ‘আল-জাবর’ (Algebra) আবিষ্কার করেন, যা আধুনিক কম্পিউটারের অ্যালগরিদমের ভিত্তি।
 - **ইবনে সিনা (Avicenna):** তাঁর রচিত ‘আল-কানুন ফিত-তিব’ (The Canon of Medicine) শত শত বছর ধরে ইউরোপের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রধান পাঠ্যবই ছিল।
 - **আল-হাইসাম (Alhazen):** আধুনিক আলোকবিজ্ঞান বা Optics-এর জনক, যিনি প্রথম প্রমাণ করেন যে চোখ থেকে আলো বের হয় না, বরং বস্তুর আলো চোখে এসে পড়ে।

১৪.৩ ইসলামি সংস্কৃতি ও বিনোদন নীতি

ইসলামি রাষ্ট্রে সংস্কৃতির ভিত্তি হলো সুরূচি, নৈতিকতা এবং তাওহিদ। ইসলাম এমন কোনো বিনোদন বা সংস্কৃতি সমর্থন করে না যা মানুষের পশুত্বকে জাগিয়ে তোলে বা সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়। সুস্থ ক্রীড়া চর্চা, সাহিত্য, ক্যালিগ্রাফি এবং স্থাপত্যশিল্পকে খিলাফাত ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ উৎসাহিত করা হয়েছে, যার প্রমাণ আজও স্পেনের আলহাম্রা প্রাসাদ বা তুরস্কের সুলতান আহমেদ মসজিদে দেখা যায়।

অধ্যায় ১৫: ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও জিম্মি নীতি (গভীর বিশ্লেষণ)

১৫.১ ‘জিম্মি’ (Dhimmis) শব্দের আইনি ও রাজনৈতিক মর্যাদা

ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের আইনি পরিভাষায় ‘জিম্মি’ বলা হয়। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোতে এই শব্দটিকে বৈষম্যমূলক মনে করা হলেও, এর প্রকৃত অর্থ অত্যন্ত গভীর। ‘জিম্মাহ’ শব্দের অর্থ হলো—নিরাপত্তা, প্রতিশ্রুতি এবং জিম্মাদারি। অর্থাৎ, তাঁরা এমন নাগরিক যাদের জীবন, সম্পদ, ইজ্জত এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার পূর্ণ দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং ইসলামি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার বিরুদ্ধে তীব্র হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَتْبَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ آبَائِهِمْ ذَنْبًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَفَّهَ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ

সাফওয়ান ইবনে সুলাইম রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের সন্তানদের সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “জেনে রেহো! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের (মুয়াহাদ) ওপর জুলুম করবে, তার অধিকার খর্ব করবে, তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেবে অথবা তার সম্মতি ছাড়া তার কোনো সম্পদ কেড়ে নেবে—কেয়ামতের দিন আমি নিজে আদালতে সেই শাসকের বিরুদ্ধে বাদী হয়ে দাঁড়াব।” — সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়: আল-জিয়য়া, হাদিস নং ৩০৫২

১৫.২ ধর্মীয় উপাসনালয় ও ব্যক্তিগত আইনের (Personal Law) সুরক্ষা

ইসলামি বিচারব্যবস্থায় অমুসলিমদের জন্য ‘বহুত্ববাদী আইনি কাঠামো’ (Legal Pluralism) রয়েছে। পারিবারিক বিষয়—যেমন বিয়ে, তালাক এবং উত্তরাধিকার—ক্ষেত্রে অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আইন অনুযায়ী বিচার পাওয়ার অধিকার রাখে। খিলাফাত রাষ্ট্র তাদের ওপর জোরপূর্বক শরিয়াহ আইন চাপিয়ে দেয় না।

হযরত উমর (রা.) যখন জেরুজালেম জয় করেন, তখন তিনি সেখানকার খ্রিষ্টানদের যে ঐতিহাসিক নিরাপত্তা সনদ দিয়েছিলেন, তাতে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল:

“এটি আল্লাহর বান্দা, আমিরুল মুমিনিন উমরের পক্ষ থেকে ইলিয়া (জেরুজালেম)-এর অধিবাসীদের জন্য প্রদত্ত আমান বা নিরাপত্তা দলিল। এই নিরাপত্তা তাদের জীবন,

সম্পদ, গির্জা ও ত্রুশের জন্য প্রযোজ্য। তাদের গির্জাগুলোতে মুসলিমরা বসবাস করবে না, সেগুলো ভেঙে ফেলা হবে না এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর কোনো প্রকার জবরদস্তি করা হবে না।” — তাবারী, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৪৯

১৫.৩ জিযয়া করার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা

পশ্চিমা ইতিহাসবিদদের অনেকেই ‘জিযয়া’ করকে অমুসলিমদের ওপর একপ্রকার জুলুম হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। তবে এর মূল উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ বিশ্লেষণ করলে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায়:

- **যাকাত বনাম জিযয়া:** ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকদের ওপর বাধ্যতামূলক ‘যাকাত’ (২.৫%) ধার্য থাকে, যা একটি ধর্মীয় ইবাদত এবং কর। অমুসলিমদের ওপর এই ধর্মীয় ইবাদত চাপানো অন্যায্য, তাই তাদের জন্য কেবল একটি নাগরিক কর নির্ধারণ করা হয়েছে, যাকে ‘জিযয়া’ বলা হয়।
- **সামরিক সেবামুক্তি:** ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিমদের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদান এবং দেশের প্রতিরক্ষায় জীবন দেওয়া ফরজ বা বাধ্যতামূলক। কিন্তু অমুসলিমদের এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাধ্য করা হয় না। জিযয়া হলো মূলত এই প্রতিরক্ষার বিনিময়ে একটি সাধারণ ফি। যদি কোনো অমুসলিম স্বেচ্ছায় সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়, তবে তার জিযয়া কর সম্পূর্ণ মওকুফ হয়ে যায়।
- **ক্ষমা ও মানবিকতা:** নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অন্ধ, মানসিক প্রতিবন্ধী এবং খ্রিষ্টান সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য জিযয়া সম্পূর্ণ মওকুফ। হযরত উমর (রা.) একবার এক বৃদ্ধ ইহুদিকে ভিক্ষা করতে দেখে তাকে রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল থেকে আজীবন পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তার গোত্রের সবার জিযয়া মওকুফ করে দিয়েছিলেন।

অধ্যায় ১৬: আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলামি সমাধান (কেস স্টাডি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ)

১৬.১ ব্যুরোক্রোটিক দুর্নীতি ও কালোটাকা প্রতিরোধ

বর্তমান বিশ্বে শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ক্যাঙ্গার হলো দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতার অভাব। ইসলামি শাসনব্যবস্থায় এর সমাধান অত্যন্ত কাঠামোগত। খিলাফাত ব্যবস্থায় ‘মুহাসাবাহ’ (Accountability) এবং ‘হিসবাহ’ (Ombudsman) নামক দুটি প্রতিষ্ঠান থাকে।

- **হযরত উমর (রা.)-এর অডিট মডেল:** তিনি যখন কোনো অঞ্চলের গভর্নর (যেমন: আমার ইবনুল আস বা আবু মুসা আশআরি রা.) নিয়োগ করতেন, তখন প্রথমে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পদের একটি নিখুঁত তালিকা তৈরি করে রাষ্ট্রীয় দপ্তরে রাখতেন। গভর্নরের দায়িত্ব পালন শেষে পুনরায় তাঁদের সম্পদের হিসাব নেওয়া হতো। যদি সম্পদের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেত, তবে তা বাজেয়াপ্ত করে বায়তুল মালে জমা করা হতো।

- **উপহার নিষিদ্ধকরণ:** সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য যেকোনো ধরনের উপহার গ্রহণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ ও ঘৃষের শামিল। হাদিস শরিফে এসেছে:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي! فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا! ۝

আবু হুমাইদ আস-সাইদি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইবনুল লুতবিয়াহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। সে কাজ শেষে ফিরে এসে বলল: “এটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ, আর এটি আমাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।” তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ মিস্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন: “কর্মকর্তাদের কী হলো! আমরা তাদের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাই, আর তারা এসে বলে—এটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ আর এটি আমার উপহার! সে কেন তার বাবার ঘরে বা মায়ের ঘরে বসে থাকল না, তখন সে দেখত তাকে কেউ উপহার দেয় কি না!” — সহিহ বুখারি, অধ্যায়: আল-হিলাল, হাদিস নং ৬৯৭৯

১৬.২ বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা

বর্তমান বিশ্ব পুঁজিপতিদের সিডিকেট, কৃত্রিম মুদ্রাস্ফীতি এবং কাগজের মুদ্রার (Fiat Currency) অবমূল্যায়নের কারণে অর্থনৈতিকভাবে জর্জরিত। ইসলামি রাষ্ট্রনীতি এর তিনটি স্থায়ী সমাধান দেয়:

1. **স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিত্তিক মুদ্রা (Asset-backed Currency):** ইসলামি অর্থনীতি কাগজের নোটের পরিবর্তে প্রকৃত মূল্যের স্বর্ণের দিনার ও রৌপ্যের দিরহাম প্রবর্তনের তাগিদ দেয়, যা কৃত্রিম মুদ্রাস্ফীতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়।
2. **মজুতদারি (Hoarding) উচ্ছেদ:** বড় বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো যেন পণ্য মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে, সেজন্য বাজারে ‘হিসবাহ’ বা ভোক্তা অধিকার টিম সার্বক্ষণিক নজরদারি রাখে।
3. **যাকাত ও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ:** প্রতি বছর ধনীদের অলস সম্পদের ওপর ২.৫% হারে যাকাত ট্যাক্স ধার্য করার ফলে পুঁজিপতিরা টাকা ব্যাংকে জমিয়ে রাখতে পারে না; বাধ্য হয়ে তাদের বাজারে বিনিয়োগ করতে হয়, যা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

১৬.৩ সামাজিক অবক্ষয়, মাদকাসক্তি ও পারিবারিক ভাঙন

পশ্চিমা সেকুলার মডেলে ‘ব্যক্তিগত স্বাধীনতার’ নামে সমাজে পর্নোগ্রাফি, সমকামিতা, লিভ-ইন রিলেশন এবং মাদকের অবাধ লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পারিবারিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে এবং মানসিক অবসাদ ও আত্মহত্যার হার বাড়ছে।

ইসলামি রাষ্ট্র কেবল অপরাধের পর শাস্তি দেয় না, বরং অপরাধের ‘উৎস’ বন্ধ করে। রাষ্ট্র জুয়া, মাদক ও অনৈতিক বিনোদনের পথ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে এবং সুস্থ পারিবারিক জীবন গঠনে তরুণ-তরুণীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থনৈতিক সহায়তা (বায়তুল মাল থেকে বিয়ের তহবিল) প্রদান করে। এর ফলে সমাজ ভেতর থেকে নিরাপদ ও শান্তিময় হয়ে ওঠে।

অধ্যায় ১৭: আন্তর্জাতিক আইন ও ইসলামি ভূ-রাজনীতি (২১শ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট)

১৭.১ আধুনিক জাতিসংঘ (UN) বনাম ইসলামি আন্তর্জাতিক আইন (Siyar)

বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘ (UN) বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এর মূল কারণ হলো ‘ভেটো পাওয়ার’ (Veto Power)—যার মাধ্যমে পাঁচটি ক্ষমতাবান দেশ পুরো পৃথিবীর সিদ্ধান্তকে নিজেদের পকেটে বন্দি করে রেখেছে। এটি মূলত ‘জোর যার মূলুক তার’ দর্শনের আধুনিক রূপ।

এর বিপরীতে, ইমাম আল-শায়বানি (১৭৯ হিজরি) লিখিত ‘কিতাবুস সিয়্যার’ হলো পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম আন্তর্জাতিক আইনের রূপরেখা। ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি হলো:

- **চুক্তির পবিত্রতা:** কোনো অমুসলিম দেশের সাথে চুক্তি বা Treaty হলে, ইসলামি রাষ্ট্র তা যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে বাধ্য। আল্লাহ বলেন:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا “আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) কৈফিয়ত তলব করা হবে।” — সূরা আল-ইসরা (১৭:৩৪)

- **সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা:** ইসলাম অন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনধিকার চর্চা বা তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য যুদ্ধ করা সমর্থন করে না। যুদ্ধ কেবল তখনই বৈধ, যখন কোনো অঞ্চলে চরম জুলুম উচ্ছেদ করা বা আত্মরক্ষা করার প্রয়োজন হয়।

১৭.২ Nation-State (জাতিরাষ্ট্র) সংকটের সমাধান: ‘ইসলামিক ইউনিয়ন’

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) যেভাবে নিজেদের মধ্যে সীমান্ত শিথিল করে একক মুদ্রা (Euro) চালু করেছে, খিলাফাত ব্যবস্থার আধুনিক রাজনৈতিক রূপ হতে পারে ঠিক তেমনি একটি ‘বিশ্বজনীন ইসলামিক ইউনিয়ন’।

বর্তমান ৫৭টি মুসলিম দেশ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দেওয়ালে বন্দি হয়ে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। খিলাফাতের আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হবে:

1. **একক পাসপোর্ট ও সীমান্তহীন উম্মাহ:** মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ভিসা মুক্ত চলাচল ব্যবস্থা।

2. **ইসলামিক কমন মার্কেট:** নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন তেল, গ্যাস ও খনিজ) নিজেদের কারেসিতে লেনদেন করা।
3. **যৌথ কমান্ড কাউন্সিল (Joint Defense):** ন্যাটো (NATO)-র মতো একটি শক্তিশালী সামরিক জোট, যা যেকোনো মুসলিম দেশের ওপর বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করবে।

১৭.৩ বিশ্বশান্তি ও মানবতার মুক্তি

ইসলামি ভূ-রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য কোনো সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, বরং মানবজাতিকে মানুষের দাসত্ব ও শোষণ থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর ইনসাফের অধীনে নিয়ে আসা। খিলাফাত ব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলে তা কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, বরং বিশ্বজুড়ে নির্যাতিত-নিপীড়িত সকল মানুষের জন্য একটি নিরাপদ ও বৈষম্যহীন পৃথিবী উপহার দেবে।

অধ্যায় সারাংশ (১৩-১৬ অধ্যায়)

এই অধ্যায়গুলোর গভীর বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থা কোনো আদিম বা মধ্যযুগীয় অচল ব্যবস্থা নয়। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিকাশ, সংখ্যালঘুদের আইনি নিরাপত্তা, আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি দমন এবং বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতির ভারসাম্য রক্ষায় ইসলামের নীতিগুলো আধুনিক যেকোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চেয়েও বেশি বাস্তবসম্মত এবং প্রগতিশীল। একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক প্রযুক্তির (যেমন AI ও ব্লকচেইন) সাথে এই নীতিগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধন করাই বর্তমান উম্মাহর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দায়িত্ব।

পরিশিষ্ট: ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দলিলের মূলপাঠ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

এই পরিশিষ্ট অংশে ইসলামি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল, চুক্তি ও ভাষণ সংকলন করা হয়েছে, যা ইসলামি শাসনব্যবস্থার আইনি কাঠামো, মানবাধিকার এবং পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। প্রতিটি দলিলের মূলপাঠ (অনুবাদ) এবং তার রাজনৈতিক গুরুত্ব নিচে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

দলিল ১: মদিনা সনদ (The Constitution of Medina — ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ)

প্রেক্ষাপট ও মূলপাঠের প্রধান অংশসমূহ

রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনায় হিজরতের পর মুসলিম (মুহাজির ও আনসার), ইহুদি এবং অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্রগুলোর মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য এই লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন। এটি ইতিহাসের প্রথম লিখিত রাষ্ট্রীয় সংবিধান।

মূল ধারা (নির্বাচিত): ১. তারা (চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ) অন্যান্য মানুষের তুলনায় একটি একক রাজনৈতিক জাতি (উম্মাতুন ওয়াহিদা) হিসেবে গণ্য হবে। ২. কোনো মুমিন কোনো কাফিরের বদলে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে না এবং কোনো কাফিরের বিরুদ্ধে কোনো কাফিরকে সাহায্য করবে না। ৩. মদিনার ইহুদিদের মধ্যে যারা আমাদের অনুগত হবে, তারা সাহায্য ও সমতার অধিকার পাবে। তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না এবং তাদের শত্রুদের সাহায্য করা হবে না। ৪. ইহুদিরা তাদের নিজেদের ধর্ম পালন করবে এবং মুসলিমরা তাদের নিজেদের ধর্ম পালন করবে। ৫. এই সনদের অন্তর্ভুক্ত গোত্রগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ বা সমস্যা দেখা দিলে, তা মীমাংসার জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে পেশ করতে হবে।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিশ্লেষণ

- **বহুত্ববাদী সমাজের স্বীকৃতি (Pluralism):** মদিনা সনদ প্রমাণ করে যে, ইসলামি রাষ্ট্র শুরু থেকেই একটি বহুমাত্রিক, বহুধর্মীয় ও বহুত্ববাদী সমাজকে আইনি স্বীকৃতি দেয়। ধর্ম ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সবাইকে একটি ‘রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্বের’ অধীনে আনা হয়েছিল।

- আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের সর্বোচ্চতা: সনদের মাধ্যমে গোত্রীয় গোঁড়ামি বা নিজস্ব প্রতিশোধ নেওয়ার প্রথা বাতিল করে আইনি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিচারিক কর্তৃপক্ষ (রাসুলুল্লাহ ﷺ) প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান শর্ত।

দলিল ২: বিদায় হজের ভাষণ (The Farewell Sermon — ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)

প্রেক্ষাপট ও মূলপাঠের প্রধান অংশসমূহ

দশম হিজরিতে আরাফাতের ময়দানে জাবালে রহমতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবির সামনে রাসুলুল্লাহ ﷺ যে ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন, তা মানবজাতির অধিকারের এক শাস্বত ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights)।

মূল বাণী (নির্বাচিত): “হে মানুষ! নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের ইজ্জত-আব্রু একে অপরের জন্য পবিত্র ও লঙ্ঘন অযোগ্য; যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহর। ... হে মানুষ! সাবধান! ধর্ম নিয়ে অতিরঞ্জন বা উগ্রতা কোরো না; কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধর্ম নিয়ে উগ্রতা করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। ... কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের, কিংবা কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের বা কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই—শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো ‘তাকওয়া’ (খোদাভীতি)। ... নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ।” — সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৭৩৯; মুসলিম, হাদিস নং ১২১৮ (সমন্বিত পাঠ)

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিশ্লেষণ

- জাতিগত বৈষম্যের চিরতরে অবসান: এই ভাষণ সমাজ থেকে বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং বংশীয় অহংকারকে চিরতরে উপড়ে ফেলে। মানুষের মর্যাদার ভিত্তি বংশ বা চামড়ার রঙ নয়, বরং তার চরিত্র ও নৈতিকতা (তাকওয়া)—এই দর্শন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের জন্য এক বৈপ্লবিক বার্তা।
- নাগরিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি: জান, মাল এবং ইজ্জত রক্ষার অধিকারকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা করে রাষ্ট্রকে তা রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দলিল ৩: হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রথম রাজনৈতিক ভাষণ (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)

প্রেক্ষাপট ও মূলপাঠের প্রধান অংশসমূহ

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর সাকিফা বনি সায়েদাহ-তে শূরার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যখন হযরত আবু বকর (রা.) প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন, তখন তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেন।

মূল পাঠ: “হে মানুষ! আমি তোমাদের ওপর আমার (শাসক) নিযুক্ত হয়েছি, অথচ আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই। যদি আমি ভালো কাজ করি, তবে আমাকে সাহায্য করো; আর যদি আমি ভুল করি, তবে আমাকে সোজা (সংশোধন) করে দিও। সততা হলো একটি আমানত, আর অসততা হলো খেয়ানত। তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল, সে আমার কাছে শক্তিশালী—যতক্ষণ না আমি তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছি (ইনশাআল্লাহ)। আর তোমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী, সে আমার কাছে দুর্বল—যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে অন্যের অধিকার আদায় করছি (ইনশাআল্লাহ)। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করব, তোমরা আমার আনুগত্য করো। আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করি, তবে আমার ওপর তোমাদের আনুগত্যের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।” — ইবনে হিশাম, আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়াহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৬০

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিশ্লেষণ

- **সীমিত ও শর্তযুক্ত আনুগত্য (Conditional Loyalty):** এই ভাষণ স্পষ্ট করে যে, ইসলামে শাসকের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কোনো স্থান নেই। শাসকের আনুগত্য ততদিনই করা হবে, যতদিন তিনি সংবিধান (কুরআন ও সুন্নাহ) মেনে চলবেন।
- **জবাবদিহিতা ও নাগরিক অধিকার:** একজন সাধারণ নাগরিকও খলিফার ভুল ধরিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে—এই নীতি খিলাফাতকে একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে।

দলিল ৪: হযরত উমর (রা.)-এর জেরুজালেমবাসীদের প্রতি নিরাপত্তা সনদ (আহদে উমরি — ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ)

প্রেক্ষাপট ও মূলপাঠের প্রধান অংশসমূহ

খলিফা উমর (রা.)-এর যুগে যখন খ্রিষ্টানদের পবিত্র নগরী জেরুজালেম বিনা রক্তপাতে বিজিত হয়, তখন খ্রিষ্টানদের প্রধান যাজক সোফ্রোনিয়াসের অনুরোধে খলিফা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

মূল পাঠ: “এটি আল্লাহর বান্দা, আমিরুল মুমিনিন উমরের পক্ষ থেকে ইলিয়া (জেরুজালেম)-এর অধিবাসীদের জন্য প্রদত্ত নিরাপত্তা দলিল। এই নিরাপত্তা তাদের জীবন, সম্পদ, গির্জা, ক্রুশ এবং তাদের সুস্থ ও অসুস্থ সবার জন্য প্রযোজ্য। তাদের গির্জাগুলোতে মুসলিমরা বসবাস করবে না, সেগুলো ভেঙে ফেলা হবে না, সেগুলোর কোনো ক্ষতি করা হবে না। তাদের সম্পত্তি থেকে কোনো কিছু হ্রাস করা হবে না। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর কোনো প্রকার জবরদস্তি করা হবে না এবং তাদের কাউকেও কোনো ধর্মীয় কষ্ট দেওয়া হবে না।” — তারিখুত তাবারী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৪৯

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিশ্লেষণ

- আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও শান্তি চুক্তি: এটি প্রমাণ করে যে ইসলাম তরবারির জোরে ধর্ম বিস্তার সমর্থন করে না। বিজিত অঞ্চলের অমুসলিমদের ধর্মীয় উপাসনালয়ের সুরক্ষার দায়িত্ব খিলাফাত নিজের কাঁধে নেয়।
- ধর্মনিরপেক্ষ আইনি সুরক্ষা: কোনো নাগরিককে তার ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে রাষ্ট্রীয় বৈষম্য বা নির্যাতনের শিকার হতে হবে না—এই চুক্তির প্রতিটি ধারা তার বাস্তব প্রমাণ।

দলিল ৫: হযরত আলী (রা.) কর্তৃক মিশরের গভর্নর মালিক আল-আশতারের প্রতি প্রেরিত প্রশাসনিক নির্দেশনামা (Letter to Malik al-Ashtar)

প্রেক্ষাপট ও মূলপাঠের প্রধান অংশসমূহ

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) যখন মালিক আল-আশতারকে মিশরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পাঠান, তখন তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা সম্বলিত একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। এটি ইসলামি প্রশাসনিক ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলিল।

মূল পাঠের অংশবিশেষ: “হে মালিক! মনে রেখো, তোমার প্রজারা দুই শ্রেণীর—হয় তারা ধর্মে তোমার ভাই, না হয় তারা সৃষ্টিতে তোমার সমকক্ষ (মানবতার দিক থেকে সমান)। তাদের থেকে ভুলত্রুটি হতে পারে, তাই তুমি তাদের প্রতি ক্ষমা ও সহনশীলতার হাত বাড়িয়ে দিয়ো; ঠিক যেভাবে তুমি আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা আশা করো। ... কখনো ভেবো না যে ‘আমি তো দেশের শাসক, আমি নির্দেশ দেব আর মানুষ তা মানতে বাধ্য’—এই মানসিকতা অন্তরকে কলুষিত করে, দ্বীনকে দুর্বল করে এবং ধ্বংসকে ডেকে আনে। ... প্রজাদের মধ্যে যারা দরিদ্র ও অভাবী, তাদের প্রতি বিশেষ নজর দিয়ো। কারণ তাদের দেখাশোনার ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে তোমাকে সবচেয়ে বেশি জবাবদিহি করতে হবে।” — নাহজুল বালাগাহ, চিঠি নং ৫৩

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিশ্লেষণ

- মানবিক আমলাতন্ত্র (Humane Bureaucracy): এই নির্দেশনামা একজন সরকারি কর্মকর্তার আচরণ কেমন হওয়া উচিত তার সর্বোত্তম গাইডলাইন। শাসক ও প্রজার সম্পর্ক ভয়ের নয়, বরং ভালোবাসা ও সেবার।
- বিশ্বজনীন মানবিক দর্শন: “সৃষ্টিতে তোমার সমকক্ষ” উক্তিটি প্রমাণ করে যে একজন অমুসলিম নাগরিকও কেবল মানুষ হওয়ার কারণে শাসকের কাছ থেকে সমমর্যাদা ও ইনসারফ পাওয়ার যোগ্য।

পরিশিষ্ট সারাংশ

এই ঐতিহাসিক দলিলসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি কোনো ভৌগোলিক আগ্রাসন ছিল না, বরং তা ছিল—ইনসারফ, মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং কঠোর প্রশাসনিক জবাবদিহিতা। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো ও সুশাসনের অভাব দূর করতে এই ধ্রুপদী দলিলগুলোর দর্শন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র (Bibliography & References)

1. আল-কুরআনুল কারীম (অনুবাদ ও তাফসির: মূল ও আঞ্চলিক সংস্করণ)।
2. সহিহ আল-বুখারি - ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি।
3. সহিহ মুসলিম - ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ।
4. সুনান আবু দাউদ - ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআস।
5. মুসনাদে আহমাদ - ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল।
6. তাফসির ইবনে কাসির - হাফিজ ইবনে কাসির।
7. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইতিহাস গ্রন্থ) - ইবনে কাসির।
8. আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ (ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞান) - ইমাম আল-মাওয়াদি।
9. ইহয়াউ উলুমিদ্দীন - ইমাম আবু হামিদ আল-গাজ্জালি।
10. মুকাদ্দিমাহ - ইবনে খালদুন।